# ঝিলিমিলি

# ঝিলিমিলি

## প্রথম দৃশ্য

[ মির্জা সাহেবের দ্বিতল বাড়ির ওপর-তলার প্রকোষ্ঠ। মির্জা সাহেবের ষোড়শী মেয়ে ফিরোজা রোগশয্যায় শায়িতা। সব জানালা বন্ধ, শুধু পশ্চিম দরজা খোলা। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। পার্শ্বে বসিয়ে মির্জা সাহেবের পত্নী হালিমা বিবি মেয়েকে পাখা করিতেছেন। বাদলায় ও বেলাশেষের অন্ধকারে ঘরের আঁধার গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। হালিমা বিবি উঠিয়া হারিকেন জ্বালিলেন। ]

ফিরোজা : মা !

হালিমা : (ছুটিয়া আসিয়া ফিরোজার মুখের কাছে মুখ রাখিলেন) কি মা ! সোনা আমার !

ফিরোজা : বাতি নিবিয়ে দাও !

হালিমা : কেন মা ? বড্ডো আঁধার যে ! ভয় করবিনে।

ফিরোজা : উঁ হুঁ। তুমি আমায় ধরে বসে থাকো। (মা-কে জড়াইয়া ধরিল।) বাতি বিশ্রী লাগে।

হালিমা : তা তো লাগবেই মা ! (দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করিলেন।) আচ্ছা, আমি কাগজ আড়াল করে দিই। কেমন ?

ফিরোজা : না। তুমি নিবিয়ে দাও। (রোগশীর্ণ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল) দাও শিগ্‌গির !

হালিমা : কেঁদো না মণি, মা আমার ! এই আমি নিবিয়ে দিচ্ছি। (বাতি নিবাইতে গেলেন। ততক্ষণে কতকগুলো বাদলা পোকা আসিয়া বাতি ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছিল। ফিরোজা তাহাই এক মনে দেখিতে লাগিল।)

ফিরোজা : নিবিয়ো না, মা ! আমি বাদলা পোকা দেখব।

হালিমা : (হাসিয়া ফিরিয়া আসিলেন) খ্যাপা মেয়ে ! আচ্ছা নিবাব না। পোকা যে গায়ে-মুখে এসে পড়বে মা, বাতিটা একটু সরিয়ে রাখি।

ফিরোজা : (চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল) না ! আমি বলছি, বাদলা পোকা দেখব !

হালিমা : (কন্যাকে চুমু দিলেন) লক্ষ্মী মা আমার ! অত জোরে কথা কোয়ো না ! ওতে অসুখ বেশি হয় ! আমি বাতি সরাচ্ছিনে।

ফিরোজা : (চুপ করিয়া বাদলা পোকা দেখিতে লাগিল) মা, আমায় একটা বাদলা পোকা ধরে দাও না!

হালিমা : ছি মানিক! পোকা ছুঁতে নেই। তুই আজ অমন করছিস কেন ফিরোজা?

ফিরোজা : (কান্নার সুরে) দাও বলছি। নইলে চেঁচিয়ে রাখব না কিছু।

হালিমা : লক্ষ্মী, মা! কেঁদো না। এই দিচ্ছি। (একটা বাদলা পোকা ধরিয়া মেয়ের হাতে দিলেন। ফিরোজা হাতে করিয়া এক মনে বাদলা পোকা দেখিতে লাগিল।)

ফিরোজা : এই যা! পাখা খসে গেল! আ-হা রে! আচ্ছা মা! বাদলা পোকার খুব লাগল?

হালিমা : তা লাগল বই কি!

ফিরোজা : তাহলে ছেড়ে দিই ওকে। মা, তুমি ওকে নিচে রেখে এস (হালিমা বাদলা পোকা নিচে রাখিয়া আসিলেন।) ... মা, বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না?

হালিমা : হাঁ মা, খুব বৃষ্টি। শুনছ না ঝমঝমানি?

ফিরোজা : আমার খুব ভালো লাগে ঐ বৃষ্টির শব্দ। ... মা, আব্বা* কোথায়?

হালিমা : বাইরে, দহলিজে* বোধ হয়।

ফিরোজা : এখন যদি আমি খুব জোরে কাঁদি, আব্বা শুনতে পাবেন?

হালিমা : ছি মা, কাঁদবে কেন? ওঁকে ডেকে পাঠাব?

ফিরোজা : না, না, ডেকো না। মা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা মা, তুমি যদি এখন গান করো, আব্বা শুনতে পাবেন?

হালিমা : ওরে দুষ্টু! বুঝেছি তোমার মতলব। ... না, মা, এখন কি আর গান করি? তোর আব্বা শুনলে রাগ করবেন।

ফিরোজা : এত বৃষ্টিতে শুনতে পাচ্ছেন কি না! মা, লক্ষ্মী মা, সোনা-মা, আস্তে আস্তে গাও না! সেই বৃষ্টি ঝরার গানটা।

হালিমা : আচ্ছা, গাচ্ছি আস্তে আস্তে। এখন কি আর গান আসে রে ফিরোজা। সেই কখন ছেলেবেলায় গেয়েছি গান। এখানে এসেই তা ভুলতে চেষ্টা করেছি। তোর আব্বা বড্ডো রাগ করেন গান শুনলে।

ফিরোজা : আচ্ছা মা, গান শুনেও কেউ রাগে? আব্বা আচ্ছা মানুষ যা হোক।

---

* আব্বা = বাবা।
* দহলিজ = বাহির-বাটি।

হালিমা : আগে কিছুদিন রাগ করতেন না। ... গান তো প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। কেবল তোর জন্যেই আজো দু-একটা মনে আছে।

ফিরোজা : আব্বা আগে রাগ করতেন না মা, তুমি গান করলে?

হালিমা : না ... তুই এখন গান শোন।

ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন-ধারা এ শাঙনে।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আঙনে॥

ঘনিমা ঘনায় ঝাউ-বীথিকায় বেণু-বন-ছায় রে
ডাহুকিরে খুঁজি ডাহুক কাঁদে রে আঁধার গহনে॥

কেয়া-বনে দেয়া তূণীর বাঁধিয়া
গগনে গগনে ফেরে গো কাঁদিয়া।

বেতস-বিতানে নীপ-তরুতলে
শিখী নাচ ভোলে পুছ-পাখা টলে।
মালতী লতায় এলাইয়া বেণী কাঁদে বিষাদিনী রে,
কাজল-আঁখি কে নয়ন মোছে তমাল-কাননে॥

ফিরোজা : মা! জানলাটা খুলে দাও। আমি মেঘ দেখব!

হালিমা : লক্ষ্মী মা! জানলা খোলে না। ঠাণ্ডা লাগবে। আমি বরং একটা গান করি, তুমি শোনো।

ফিরোজা : না মা। আর গান আমি সইতে পারব না। খোলো না মা, জানলাটা। (হালিমা দক্ষিণের জানালা খুলিতে গেলেন) ওটা না মা, ঐ পুব-দিককার জানলাটা খোলো। পুবের হাওয়ায় কদম ফোটে, না মা?

হালিমা : ও-দিককার জানলা খুললে তোর আব্বা আমায় আর জ্যান্ত রাখবেন না, ফিরোজা! এই দক্ষিণের জানলাই খুলি। (দক্ষিণের বাতায়ন খুলিলেন। দূরে বনের আভাস দেখা যাইতেছে। বৃষ্টিধারায় বন ঝাপসা হইয়া আসিতেছে।)

ফিরোজা : (দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া পাশ ফিরিল। আবার পাশ ফিরিয়া আগেকার মতো করিয়া শুইয়া জানালার দিকে তাকাইয়া থাকিল। বোধ হয় সে কাঁদিতেছিল।) মা!

হালিমা : মা আমার! তুই কাঁদছিস ফিরোজা?

ফিরোজা : আচ্ছা মা, আব্বা তোমায় খুব ভালোবাসেন?

হালিমা : বাতিটা এখন সরিয়ে রাখি? তোর চোখে লাগছে, না?

ফিরোজা : আচ্ছা রাখো। কিন্তু তুমি বলো ...

হালিমা : (বাতি সরাইয়া রাখিলেন।) এখন একটু চুপ করে ঘুমোও ফিরোজা। বকলে আবার অসুখ বাড়বে।

ফিরোজা : আচ্ছা, তুমি না-ই বললে। আমি সব বুঝি। আব্বা কখ্খনো কাউকে ভালোবাসেননি। নইলে মানুষ কখনো এমন নীরস আর নিষ্ঠুর হয়!

হালিমা : তুই কি থামবিনে ফিরোজা লক্ষ্মী মা আমার, কেন মন খারাপ করছ এত, বলো তো! আজ যে তোকে চুপ করে থাকতে বলে গেছে ডাক্তার।

ফিরোজা : আচ্ছা মা, কাল থেকে ঐ পুব-দিককার জানলাটা খুলবে তো, তখন তো আর আব্বা বকবেন না?

হালিমা : (শিহরিয়া উঠিলেন। কান্নায় তাঁহার গলা ভাঙিয়া আসিল।) ও কি কথা বলছিস ফিরোজা?

ফিরোজা : কাল আর ও-জানলা খুলতে বলব না মা! (বালিশে মুখ লুকাইল।)

হালিমা : (হঠাৎ পাথরের মতো স্থির হইয়া গেলেন। কণ্ঠ তাঁহার অশ্রুবিকৃত হইয়া উঠিল।) বুঝেছি রে হতভাগী, সব বুঝেছি। তুই আমাদের বড় শাস্তি দিয়ে যাবি।... মা, এই আমি খুলে দিচ্ছি পুব-জানালা, তুই অত অধীর হোসনে। (পুব-জানালা খুলিয়া দিতেই সম্মুখের বাড়ির মৃদু-আলোকিত বাতায়ন দেখা গেল। বাতায়নপথে কে যেন ছটফট করিয়া ফিরিতেছে। দূর হইতে তাহাকে ছায়ামূর্তির মতো দেখা যাইতেছিল। ছায়ামূর্তি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল যেন এই বাতায়ন-পানেই সে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। হালিমা আড়ালে চক্ষু মুছিলেন।)

ফিরোজা : (ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাতায়ন-পথে তাকাইয়া রহিল।) মা, বাঁশি বাজছে না? উঁহুঁ, কে যেন কাঁদছে! (অস্থির হইয়া) বাইরে কে কাঁদে মা? মা, মা, শোনো!

হালিমা : কই মা, কিছু না। ও বৃষ্টির ঝরঝরানি।... হুঁ ... না ... হাবিব বুঝি গান করছে এসরাজ বাজিয়ে।

ফিরোজা : আহ্! বৃষ্টিটা যদি থামত, গানটা শুনতে পেতাম... বৃষ্টি থেমে আসছে—না মা?

হালিমা : হাঁ মা, বৃষ্টিটা ধরে এল।

ফিরোজা : মা—মা! এইবার শুনতে পাচ্ছি গান। আহ্! একটু শব্দ না হয় যেন। মা তুমি চুপ করে শোনো। (বাতায়ন হইতে গান ভাসিয়া আসিতেছিল।)

গান

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে।
দূরে যত পলাতে চাই, নিকট ততই বাঁধে॥

স্বপন-শেষে বিদায়-বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায়
ভোরের করুণ চাঁদে॥

বাহির আমার পিছল হলো কাহার চোখের জলে।
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যত চলে।

পার হতে চাই মরণ-নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি,
আমায়—ওগো বে-দরদি-
ফেলিলে কোন্ ফাঁদে॥

[ গান শেষ হইলে বাতায়নের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সেই আলোকে এই প্রিয়দর্শন তরুণের মূর্তি স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। সে স্থির দৃষ্টিতে এই দিকেই তাকাইয়া আছে। ]

ফিরোজা : মা—মা-মণি! ঘরের বাতিটা খুব উজ্জ্বল করে দাও। যেন আমায় খুব ভালো করে দেখা যায় ও-বাড়ি হতে। (বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল।)

হালিমা : ওরে ফিরোজ! বন্ধ কর, বন্ধ কর, পুব-জানালা। তোর আব্বা আসছেন। (মির্জা সাহেব গৃহে প্রবেশ করিতেই একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ নিবিয়া গেল। হালিমা আবার বাতি জ্বালাইলেন।)

মির্জা সাহেব : আর জানলা বন্ধ করতে হবে না। আমি বহুক্ষণ থেকেই তোমাদের কীর্তি দেখছি। দেখো আর যা-ই করো, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেষ্টা করো না। (হালিমা নিরুত্তর) ... আর ঐ বাঁদর ছোঁড়াটাকেই বা কি বলি! এক গাছা কাঁচা বেত নিয়ে বেতিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ... (ক্রোধে বদ্ধমুষ্টি হইয়া দাঁত কড়মড় করিয়া উঠিলেন।) দিনরাত গান আর গান! বাঁশি আর এস্রাজ! স্থিরচিত্তে একটু 'কোরআন তেলাওত' করবার কি নামাজ পড়বার জো নেই! হতচ্ছাড়া পাজি কোথাকার! ঐ বিশ্ব-বখাটে আবার বলে, পাশ করবে বি.এ.। ও তো ফেল করেই আছে। ঐ রত্নের সঙ্গে দেবো মেয়ের বিয়ে!

হালিমা : দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, আজ একটু আস্তে কথা কও, আজ ফিরোজা কেমন যেন করছে!

মির্জা সাহেব : (পুব-দিককার জানলাটা বন্ধ করিতে করিতে) হুঁ! ... তা এমন করে জানলা খুলে তাকিয়ে থাকলে যে-কোনো আইবুড়ো মেয়েরই অসুখ করে। ... দেখো, তুমিই ফিরোজার মাথা খেলে। আর ওই বুড়ো বয়সেও তোমার গান গাওয়ার অভ্যেস গেল না। কী ভুলই করেছি স্কুলে-পড়া মেয়ে বিয়ে করে!

হালিমা : সত্যি, এ ভুল না হলে দুইজনই বেঁচে যেতাম। আমি এ-কথা ভাবতে পারিনে যে, কোনো কোনো গ্রাজুয়েট গোঁড়ামিতে কাঠ-মোল্লাকেও হার মানায়!

মির্জা সাহেব : শরিয়তের বিধি-নিষেধ মানাকে তুমি গোঁড়ামি মনে করো, এ অভিযোগ তো বহুবার শুনেছি, হালিমা। আর কোনো নতুন কথা শোনাবার থাকে তো বলো!

হালিমা : আছে। তোমার মতো শরিয়তের টিন-বাঁধানো হৃদয়ে তা কি লাগবে? ... একটু আগে গানের খোঁটা দিচ্ছিলে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি গান গাইতে পারি জেনেই তুমি আমায় বিবাহ করে কৃতার্থ করেছিলে!

মির্জা সাহেব : ভুলিনি সে-কথা! কিন্তু তখন জানতাম না তোমার গান শুধু চোখের জল, শুধু ব্যথা। কেন গান শরিয়তে নিষিদ্ধ, তা আমার চেয়ে কেউ বেশি বুঝবে না। শরিয়তে যিনি সংগীত নিষিদ্ধ করেছিলেন, তিনি জানতেন এর ব্যথা দেওয়ার পীড়া দেওয়ার শক্তি কত!

হালিমা : আমি এও জানি, যিনি এই শরিয়তের স্রষ্টা, তিনি গান শুনে আনন্দও পেয়েছেন। যাক, তর্ক করবার স্থান এ নয়। মেয়েটাকে একটু শান্তিতে মরতে দেবে কি?

মির্জা সাহেব : দেখো, জীবনে হয়তো শান্তি দিইনি তোমাদের। আমার বিশুষ্ক জীবনে তোমাদের জন্যে হাসির ফুল ফুটাতে পারিনি, শুধু কাঁটাই ফুটিয়েছি। কিন্তু মরণেও তোমাদের অশান্তি হানব, এত বড় গালি আমায় না-ই দিলে!

(হালিমা চমকিয়া উঠিলেন, ফিরোজা পাশ ফিরিয়া জলসিক্ত চোখে তাহার বাবার দিকে তাকাইল—মির্জা সাহেব পায়চারি করিতে লাগিলেন।)

ফিরোজা : আব্বা! আমার পাশে এসে বসো।

মির্জা সাহেব : (কাঁপিয়া উঠিলেন) ... হালিমা! তুমি ফিরোজাকে দেখো, আমি ডাক্তার ডাকতে চললাম।

ফিরোজা : আব্বা! আব্বা! দেখছ না কিরকম ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো আবার। তুমি যেয়ো না। আমি আর ওষুধ খাব না। একটু কাছে এসে বসো আজ লক্ষ্মীটি।

মির্জা সাহেব : (হঠাৎ শুষ্ক হইয়া উঠিলেন।) কিন্তু আমি থাকলে তো তোমার অসুখ আরো বেড়ে উঠবে, মা!

ফিরোজা : না, আজ আর বাড়বে না। তুমি এস (মির্জা সাহেব তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন) ... আব্বা, আজ আমি খুব যা-তা বকব, তুমি কিছু বলবে না বল।

মির্জা সাহেব : আচ্ছা মা, বল।

ফিরোজা : তুমি ঐ পুব-জানলাটা খুলতে দাও না কেন?

মির্জা সাহেব : (হঠাৎ কঠোর হইয়া উঠিলেন) ও ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, বাঁদর! ... কিন্তু মা, তুমি ভালো হয়ে ওঠো! ও যদি বি. এ. পাশ করতে পারে এবার, তাহলে ঐ বাঁদরের গলাতেই মোতির মালা দেবো—এও তো বলে রেখেছি।

ফিরোজা : কিন্তু আমি তো আর ভালো হব না আব্বা।

মির্জা সাহেব : (শিহরিয়া উঠিলেন) না, মা, ভালো হবে। এখনই তো ডাক্তার আসবে।

ফিরোজা : উহুঁ, কিছুতেই ভালো হবো না আমি। ... আচ্ছা আব্বা, তুমি ওকে এ-বাড়ি আসতে দাও না কেন?

মির্জা সাহেব : (হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া চিৎকার করিয়া) আমি ওকে খুন করব! শয়তান আমার মেয়েকে খুন করেছে।

[ বাহির দ্বারে করাঘাত শোনা গেল ]

হাবিব : আমি এসেছি। আমায় খুন করুন।... মা, একটিবার দোর খুলে দিন।

মির্জা সাহেব : খবরদার! কেউ দোর খুলো না। বেরোও পাজি এখান থেকে।

হাবিব : পাশের খবর বের হয়েছে।

মির্জা সাহেব : পাশ করেছ?

হাবিব : এখনো খবর পাইনি। তার করেছি। হয়তো এখুনি খবর আসবে।

মির্জা সাহেব : মিথ্যাবাদী। আগে খবর আসুক, তারপর এসো। এখন বেরোও। মেয়ের অসুখ বেড়েছে।

হালিমা : আহা, দাও না বাছাকে আসতে। একটু দেখে যাবে বই তো নয়! ক'দিন থেকে ছেলেটা যেন ছটফটিয়ে মরছে।

মির্জা সাহেব : হাঁ, আর সেই দুঃখে নতুন নতুন গান গাওয়া হচ্ছে। চুপ করো তুমি। (চিৎকার করিয়া) এখনো দাঁড়িয়ে আছে?

হাবিব : আছি। আমায় খুন করবেন বলেছিলেন। খুন করুন, তবু একবার দোর খুলুন মির্জা সাহেব।

মির্জা সাহেব : দেখেছ ব্যাটার মতলব। নিশ্চয় সাথে পুলিশ নিয়ে এসেছে। আমায় বলিয়ে নিতে চায় যে, আমি খুন করব বলেছি। আমি কখ্খনো খুন করব বলিনি, তুমি লক্ষ্মী-ছেলের মতো বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো।

ফিরোজা : কেন এত অপমান সইছ আমার জন্যে, তুমি যাও। আমি তোমায় পেয়েছি।

হাবিব : পেয়েছ?

ফিরোজা : হ্যাঁ, পেয়েছি।

হাবিব : কিন্তু, আমি তো পাইনি।

ফিরোজা : কাল পাবে। আমি আজ তোমার উদ্দেশে যাব পুব-জানলা দিয়ে। তুমি তোমার বাতায়নের ঝিলিমিলি খুলে রেখো।

হাবিব : কিন্তু তোমার বাতায়ন তো রুদ্ধ।

ফিরোজা : যখন যাব, তখন আপনি খুলে যাবে।

হাবিব : তবে যাই আমি।

ফিরোজা : যাও। যাওয়ার কালে আমার ঝিলিমিলি-তলে সেই যাওয়ার গানটা শুনিয়ে যাও।

[ হাবিবের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ]

শুকাল মিলন-মালা, আমি তবে যাই।
কি যেন এ নদী-কূলে খুঁজিনু বৃথাই॥

রহিল আমার ব্যথা
দলিত কুসুমে গাঁথা,
ঝুরে বনে ঝরা পাতা—
নাই কেহ নাই॥

যে-বিরহে গ্রহতারা সৃজিল আলোক,
সে-বিরহে এ-জীবন জ্বলি পুণ্য হোক।

চক্রবাক চক্রবাকী
করে যেমন ডাকাডাকি,
তেমনি এ-কূলে থাকি
ও-কূলে তাকাই॥

ফিরোজা : মা ! মা ! আমার কেমন করছে। মাগো, তুমি আমায় ধরো ! আব্বা, তুমি যাও। তোমায় ভালো লাগে না। ... মা ! মা ! এত বাতি জ্বলে উঠল কেন? (মূর্ছিত হইয়া পড়িল)

হালিমা : ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, যাও ডাক্তারকে দেখো একটু। মা ! সোনা মা আমার ! লক্ষ্মী মা ! ফিরোজ !

মির্জা সাহেব : ফিরোজ ! মা ! তুই ফিরে আয় ! আমি হাবিবকে ফেরাতে যাচ্ছি।

[ বিদ্যুৎবেগে বাহির হইয়া গেলেন। ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ স্থান স্বপ্নপুরী। সাদা মেঘের পাল-টাঙানো সপ্তমী চাঁদের পানসিতে চড়িয়া হাবিব ও ফিরোজা ভাসিয়া চলিতেছে। শ্বেত-মরালীর সারি ডানা দিয়া দাঁড় টানিতেছে। তাদের ভিড় করিয়া ঘিরিয়াছে চকোর-চকোরী। ময়ূর-কণ্ঠী আলোতে হাবিবের মুখ এবং ফিরোজার মুখ রাঙিয়া উঠিয়াছে। সারা আকাশ যেন যুঁই-বাগানের মতো বিকশিয়া উঠিয়াছে। ]

ফিরোজা : এ আমরা কোথায় এসেছি, হাবিব ?

হাবিব : (হাসিয়া) ছি, নাম ধরে ডাকতে নেই এখানে। এখানে আসতে হয় নাম হারিয়ে, সকল নামের দিশা ছাড়িয়ে। এখানে হাবিবও আসতে পারে না, ফিরোজাও আসতে পারে না।

ফিরোজা : তবে যে আমরা এসেছি।

হাবিব : একবার চাঁদের জ্যোৎস্না-মুকুরে ভালো করে নিজের মুখ দেখো দেখি।

ফিরোজা : (সভয়ে) এ কি, আমি যে আমায় চিনতে পারছিনে ! এ আমি কে ?

হাবিব : (হাসিয়া) কার মতো বোধ হয় ?

ফিরোজা : এ যেন—এ যেন সকলের মুখ। এ যেন শকুন্তলার, এ যেন মালবিকার, এ যেন মহাশ্বেতার মুখ। এ যেন লায়লির, এ যেন শিরির মুখ !

হাবিব : সত্যিই তাই, তোমার মুখে আজ নিখিল-বিরহিনী ভিড় করেছে। এখানে আসতে হয় শুধু 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া' হয়ে। এখানে নর-নারী অ-নামিক। এ-লোকে নর-নারীর পরিচয়-সঙ্কেত 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া'। এখানে ডাকতে হয় শুধু 'প্রিয়তম' বলে।

ফিরোজা : (লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল, চাঁদকে ঘিরিয়া রামধনুর সাত-রঙা শোভা বিজলির মতো খেলিয়া গেল !) যাও ! (কানে কানে) চকোর-চকোরী শুনতে পাবে যে !

হাবিব : শুনুক। ধরায় আমাদের যে কথা কানাকানি হয়ে আছে, তারায় তারায় আজ তারি জানাজানির হুল্লোড় পড়ে গেছে। দেখছ না প্রিয়তম ! কত নব নব তারা জন্ম লাভ করল সৃষ্টির নীহারিকা-লোকে, শুধু ঐ কানে-কথাটি শুনবার লোভে। ঐ কানে-কথা শুনবে বলেই তো চন্দ্রলোকে এত চকোর-চকোরীর ভিড় !

ফিরোজা : এ কোন লোক, প্রিয়তম ? (চাঁদ দুলিয়া উঠিল)

হাবিব : দেখলে ? চাঁদ দুলে উঠল তোমার 'প্রিয়তম' ডাকের নেশায় ! ... এ স্বপ্ন-লোক !

ফিরোজা : স্বপ্ন-লোক ! তাহলে এ-স্বপ্ন টুটে যাবে ? আবার তোমায় হারাব ?

হাবিব : হয়তো হারাবে, হয়তো হারাবে না ; জানিনে।... এ স্বপ্ন-লোক এত ক্ষণিক বলেই এত সুন্দর। ... না, না, এ স্বপ্ন-লোক চিরদিনের, এ সুন্দরের আকাঙ্ক্ষালোক, এর কি মৃত্যু আছে ? এর কি শেষ আছে ?

ফিরোজা : তবে ভয় হয় কেন ? এখনই এর শেষ হয়ে যাবে মনে করে ?

হাবিব : ঐ শেষের ভয়—ঐ হারাবার ভয় আছে বলেই এত মধুর এ-লোক। তাই তো এমন জড়িয়ে ধরে আছি পরস্পরকে। চোখের পাতা ফেললেই এ স্বপ্ন টুটে যাবে ভয়েই তো এমন পলক-হারা হয়ে চোখে চোখে চেয়ে থাকি। ঐ হারাবার ভয়েই তো চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র এমন বিপুল আবেগে পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না,—পায়ে পায়ে ঘুরে ফিরছে।

ফিরোজা : তাহলে এই বেহেশ্‌ত্ ?

হাবিব : এই বেহেশ্‌ত্।

ফিরোজা : তাহলে আর যারা বেহেশ্‌তে এসেছে তারা কই ? শিরি, লায়লি, জুলেখা ? আর ফরহাদ, মজনুঁ, ইউসুফ ?

হাবিব : আমাকে ভাল করে দেখো দেখি।

ফিরোজা : (সভয়ে হাবিবকে জড়াইয়া ধরিল) ওগো, একি ! তোমার এত বিপুলতা আমি সইতে পারব না। তুমি যেন নিখিল-পুরুষ, তুমি যেন অনন্তকাল ধরে কাঁদছ।

হাবিব : (হাসিয়া ফিরোজার কপোলে তর্জনি ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়া মৃদু আঘাত করিতে লাগিল) ভয় নেই, প্রিয়তম ! আর একবার দেখো, তুমি যাকে দেখতে চাইবে তাকেই দেখতে পাবে আমার মুখে।

ফিরোজা : (তাকাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল) আচ্ছা, বেহেশতের হুর-পরি সব কই ?

হাবিব : তুমি ইচ্ছা করলেই তারা আসবে। এখানে বাসনা দিয়ে তাদের সৃজন করতে হয় !

ফিরোজা : তারাও সব তাহলে আমাদের মধ্যে ?

হাবিব : হাঁ, এখানে—এই স্বর্গলোকে—শুধু দুটি নরনারী—তুমি আর আমি—অনন্তকাল ধরে মুখোমুখি বসে আছে। তাদের চোখে পলক নেই। বুঝি পলক পড়লেই বিশ্ব কেঁদে উঠবে। হারিয়ে যাবে সুন্দর এ স্বর্গ-লোক। হারিয়ে যাব আমি আর তুমি।

ফিরোজা : (হাবিবকে জড়াইয়া ধরিল) প্রিয়তম !

হাবিব : (ফিরোজার কপোলে কপোল রাখিয়া) প্রিয়তম।

[ চন্দ্র দোল খাইতে লাগিল ! চকোর-চকোরী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হাবিব ও ফিরোজ চাঁদের সাথে দোল খাইতে খাইতে অস্ত গেল। ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ মির্জা সাহেবের অন্দরমহল। ফিরোজা পালঙ্কে মূর্ছিতা। ঘরে ডাক্তার, হালিমা, মির্জা সাহেব। ... ভোর হইয়া আসিয়াছে। আকাশ তখনো মেঘাচ্ছন্ন। মেঘলা আকাশ চিরিয়া 'বৌ কথা কও' পাখির স্বর দূর হইতে দূরান্তরে মিশিয়া গেল। প্রদীপ-শিখা ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। হালিমা বারে বারে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন ও কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছেন। মির্জা সাহেব অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ পুবের জানলাটা পরিপূর্ণরূপে খুলিয়া দিলেন। হাবিবদের বাড়ি প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখা গেল। হাবিবদের কামরার বাতায়ন রুদ্ধ। শুধু ঝিলিমিলি খোলা। ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়া নিবু-নিবু দীপশিখার মলিন আলো কান্নার মতো করুণ হইয়া দেখা দিতেছে। ভিতরের আর কিছু দেখা যাইতেছে না। ডাক্তার বারে বারে নাড়ি দেখিতেছেন। শেষে হাতে একটা ইঞ্জেকশন দিয়া ডাক্তার কাহাকেও কিছু না বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে উঠিয়া গেলেন। ]

ফিরোজা : (নড়িয়া উঠিল) মাঃ !

হালিমা : (ছুটিয়া গিয়া ফিরোজার উপর যেন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন) মা ! মা আমার ! ফিরোজ ! ফিরে এসেছিস ! মানিক আমার ! জাদু আমার !

মির্জা সাহেব : ফিরোজ ! মা ! আবার চললাম খুঁজতে তাকে। ঐ সকাল হয়ে এল। আল্লাহ ! এবারটি আমায় মাফ করো। আমি তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি। হালিমা ! মাকে আমার ধরে রেখো। আমি হাবিবকে খুঁজতে চললাম। (ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন)

ফিরোজা : মা-মণি খুব কেঁদেছ বুঝি ? ও কি ! পুব-জানলা খুললে কে ?

হালিমা : (ললাটে গভীর চুম্বন আঁকিয়া দিলেন) তোমার আব্বা।

ফিরোজা : মা, আব্বাকে ডাকো।

হালিমা : তিনি যে হাবিবকে ডাকতে গেলেন, মা ! আজ তোদের বিয়ে (মা ম্লান হাসি হাসিলেন)।

ফিরোজা : (উজ্জ্বল হাসি হাসিয়া) মা, তুমি আব্বাকে খুব ভালোবাস ?

হালিমা : (হাসিয়া) আজ তোর সাথে সাথে প্রথম ভালোবাসলুম।(মুখ ফিরাইলেন)

ফিরোজা : (মার হাতে চুমু খাইল) দুষ্টু মেয়ে ! তাহলে তোমাদেরও আজ বিয়ে হলো। তাহলে আমি তোমাদের কে হলাম ?

হালিমা : খ্যাপা মেয়ে ! তুই আমাদের মা হলি ! হলো তো ?

ফিরোজা : (হঠাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া হাবিবের ঝিলিমিলির পানে তাকাইয়া থাকিল) মা ! মা ! ও জানালা বন্ধ কেন ?

হালিমা : অভিমানী ছেলে—রাত্রে কোথায় চলে গেছে। যাবে আর কোথায়? এখ্খুনি হয়তো আসবে। তোমার আব্বা ওকে না নিয়ে ফিরছেন না।

ফিরোজা : (শয্যায় ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর মতো লুটাইয়া পড়িল) মা! মা গো! সে আর ফিরবে না। আমার স্বপ্নই তাহলে সত্য হলো। ঐ অস্তচাঁদের চোখে তার অশ্রু লেগে রয়েছে। মা! মা! ও কি? ও কার গান? (দূরে হাবিবের ক্লান্ত কণ্ঠের করুণ বিলাপ-গীতি শোনা যাইতেছিল।)

গান

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয় তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন॥

নতুন পরিচয়ের লাগি
তারায় তারায় থাকি জাগি
বারে বারে মিলন মাগি
বারে বারে হারাই হেন॥

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলিমিলি।

নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস-রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন॥

ফিরোজা : মা! মা! চাঁদের পার হতে ভেসে আসছে ও-গান। ও-গান স্বপন-লোকের, ও-গান বেহেশ্‌তের। মা—গো—!

হালিমা : হাবিব! হাবিব! ছুটে আয় বাপ আমার। তোর ফিরোজা চলে যায়। মা! আমার রে! (লুটাইয়া পড়িলেন)

হাবিব : (ঝড়ের বেগে দ্বারে করাঘাত হানিয়া) মির্জা সাহেব! দোর খুলুন! খোলো দ্বার! 'তার' পেয়েছি। আমি বি. এ. পাশ করেছি। খোলো দ্বার। (দ্বারে পদাঘাত করিল, দ্বার ভাঙিয়া পড়িল।) মা! মা! ফিরোজ কই, আমি পাশ করেছি। এই দেখ 'তার'—পারদর্শিতার সহিত পাশ!

হাবিব : (ক্রন্দন-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল) চলে গেছে?

হালিমা : চলে গেছে—ঐ পুব-জানলা দিয়ে। বললে, 'চললাম ঐ জানলার ঝিলিমিলি খুলতে!'

হাবিব : মা! আমি তাকে খুঁজতে চললাম। ঐ অস্ত-চাঁদের চোখে তার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছি। [ঝড়ের বেগে চলিয়া গেল]

যবনিকা

# সেতু-বন্ধ

## —কুশীলবগণ—

[ ইট, কাঠ, পাথর, লোহা, যন্ত্র, যন্ত্রী, ভারবাহী পশু ও মানুষ, পীড়িত মানবাত্মা, সেতু, মেঘ, বৃষ্টিধারা, তরঙ্গ, পদ্মা, জলদেবী, মীনকুমারি, ঝড়, বজ্রশিখা, বন্যা... ]

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

### মেঘলোক

[ মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে 'মেঘ'-এর প্রবেশ। 'মেঘ'-এর নীলাঞ্জন অনুলিপ্ত অঙ্গ, উচ্ছৃঙ্খল ঝামর চুল স্কন্ধদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। চূড়ায় বঙ্কিম শিখীপাখা ফিকে-নীল ফিতা দিয়া বাঁধা। ললাটে বহ্নিশিখা-রং এর প্রদীপ রক্তচন্দন যেন বজ্বাগ্নি। স্নিগ্ধ নয়নে ঘন কাজল-ঝলমল করিতেছে,—যেন এখনি জল ঝরিয়া পড়িবে। গলায় হলুদ-রাঙা রাখি দিয়া বাঁধা গম্ভীর নিনাদী মৃদঙ্গ। পরণে পেনিসল দিয়া ঘষা গ্লেট রং-এর ধরা ও ঢিলা নিমাস্তিন। দুই হাতের মণি-বন্ধে কাঁচা সোনার বলয়-কঙ্কণ। মৃদঙ্গে আঘাত হানার বিরতিতে দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সুবর্ণ-কঙ্কণ-বলয় বিজুরির ঝিলিক হানিতেছে। পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া সাত-রঙা বিরাট জলধনু।

অন্তরীক্ষ হইতে স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠের একতান-সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে—সেই গানের তালে তালে 'মেঘ'-এর মৃদঙ্গ বাদন ও নৃত্য।]

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু॥

সে নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি
শোনাও নব-বাণী
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু॥

ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি,
সে শশী-চমকে গো বিজলি ওঠে ঝলি
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মূরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা,
ধরা নিরম্বু॥

[ গান করিতে করিতে একদল নৃত্যপরা কিশোরীর বেশে 'বৃষ্টিধারা'র প্রবেশ। তাদের পরনে মেঘ-রং কাঁচুলি, ধানী-রং ঘাগরা—পাড় জরির। নীল জমিনে সাদা ডোরা-কাটা কাপড়ের হালকা উত্তরীয়। পায়ে ছড়া নুপুর, কারুর পায়ে পাঁইজোর গুজ্‌রি। সবুজ আলতা-ছোপানো পদতল। হাতভরা সোনালি রঙ রেশমি চুড়ি, কঙ্কণ, কেয়ূর। শ্রোণীতে ফোটা-কদমের ঢিলে চন্দ্রহার। বুকে যুঁই-চামেলীর গোড়ে মালা। আঁখি-পাতায় কূলে কূলে চিকন কাজলরেখা। কপোল কেতকিপরাগ-পাণ্ডুর। জোড়া ভুরু লুলিতে অলকে হারাইয়া গিয়াছে। ভুরু-সন্ধিতে কাঁচপোকার টিপ। কর্ণমূলে শিরীষ-কুসুম। কারুর কটিতটে ছোট্ট গাগরি, কারুর হাতে ফুল-ঝারি। কেহ বিলম্বিতবেণী, কেহ আলুলায়িত কুন্তলা। বিলম্বিত-বেণী কিশোরীরা আনমনে স্খলিত মন্থরগতিতে পদচারণা করিয়া ফিরিতেছে, মুক্ত কুন্তলা বালিকারা নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে, জড়াজড়ি করিয়া—ঘুরিয়া ফিরিয়া। এক কোণে একটি বালিকা একরাশ কেয়াফুল বুকে জড়াইয়া পা ছড়াইয়া উদাস চোখে চাহিয়া আছে। 'বৃষ্টিধারা'র নৃত্য-গানের ছন্দে ছন্দে অন্তরীক্ষ হইতে রাশি রাশি যুঁই, চামেলি, বেলি, বকুল, দোপাটি, টগর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ঐ গানের তালে তালে 'মেঘ'-এর মৃদঙ্গ বাদন ও নৃত্য। ]

বৃষ্টি-ধারার গান

অধীর অম্বরে গুরু গরজনে মৃদঙ্ বাজে।
রুমু রুমু ঝুম্ মঞ্জরীর-মালা চরণে আজ উতলা যে।

এলোচুলে দুলে দুলে বন-পথে চল আলি,
মরা গাঙে বালুচরে কাঁদে যথা বন্-মরালি।

উগারি গাগরি-ঝারি
দে লো দে করুণা ডারি,
ঘুঙট উতারি বারি
ছিটালো গুমোট সাঁঝে॥

তালিবন হানে তালি, মুয়ুরী ইশারা হানে ;
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে।

মুকুলে ঝরিয়া পড়ি আকুতি জানায় যুথি,
ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তুতী।
কাজল-আঁখি রসিলি
চাহে খুলি ঝিলিমিলি,
চল লো চল সেহেলি
নিয়ে মেঘ-নটরাজে

[ বৃষ্টিধারার বালিকাদের নাম—রেবা, চিত্রা, কঙ্কা, চূর্ণা, মঞ্জু, নীরা, বিন্দু, নীপা, কৃষ্ণ, চম্পা, অশ্রু, মন্দা। ]

মেঘ : ওগো নৃত্যপরা নূপুরিকার দল ! তৃষ্ণাতুরা ধরার আবেদন কি এতদিনে পৌঁছল তোমাদের দরবারে ? চাতকির চঞ্চু যে বিশুষ্ক হয়ে উঠল তোমাদের করুণা যেচে যেচে।

মন্দা : (সেই আনমনা বালিকাটি, যে একরাশ কেয়া বুকে করে বসে ছিল) সত্যি বলেছ রাজা, দিদিদের আর নূপুর পরাই হয় না। কাজল ঘষে ঘষে চোখে জল ভরে এল, তবু কাজল পরাই আর শেষ হয় না ! আমি তো কোন সকালে উঠে কেতকি-বিতানে এসে পথ চেয়ে বসে আছি। (বেণী জড়াইতে জড়াইতে) বেণীটাও জড়াবার ফুরসৎ পাইনি।

রেবা : আরে বাপু সব-তাতেই অতিরিক্ত তাড়া-হুড়ো। আমরা বলি, নট-রাজের মাদলই আগে বেজে উঠুক, ঝলুকই আগে বিজলির ইঙ্গিত—তা না—মেঘ না চাইতেই জল ! ভোর না হতেই বেরিয়েছেন পাড়া বেড়াতে ! একবার তমালতলায়, একবার কদম-শাখায়, একবার পাহাড়তলীর শাল-বীথিকায়, একবার কেয়াবনের নাগ-পল্লীতে—

মন্দা : আর তোমরাই বা কিসে কম রেবা-দি ? ঘুমুর বাঁধছ তো বাঁধছই। ঝিল্লি বেচারি সন্ধে থেকে সুর দিয়ে হয়রান ! কেশ এলো করছ তো করছই ! কত যে বিজুলি-ফিতে ছিঁড়ল—কত যে লোধ ফুলের প্রাণ গেল গাল রাঙাবার রেণু জোগাতে !

বিন্দু : তুই থাম মন্দা ! আচ্ছা রাজা, আজ যে অসময়ে তোমার মৃদঙ্গে তালি পড়ল ! আমরা সব কেউ সাগর-দোলায় কেউ শৈল-শিরে ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ জেগে দেখি কিরণ-মালা পূর্বে-হাওয়ায় পাল্কি নিয়ে হাজির, হাতে তার নীপের শাখা।

মেঘ : তোমাদের অভিযানে বেরুতে হবে, বিন্দু !

বৃষ্টিধারার সকলে : অভিযানে বেরুতে হবে ? আবার কার বিরুদ্ধে অভিযান, রাজা ? এবার কোন দৈত্যপুরী ভাঙবে ?

মেঘ : গন্ধর্ব-লোকের পদ্মাদেবী আমাদের স্মরণ করেছেন। তাঁর বুকের ওপরে বাধ বাঁধবার জন্যে নাকি দুর্দান্ত যন্ত্রপাতির ষড়যন্ত্র চলেছে। পদ্মা এ অপমান সইবেন না। তিনি আমাদের সাহায্য চান।

চিত্রা : ওমা, কি হবে? যন্ত্রপাতির স্পর্ধা তো কম নয়! তার রাজ্য পশ্চিম হতে ক্রমেই পূর্বে প্রসারিত হয়ে চলেছে উন্মত্ত বুভুক্ষায়—তা দেখছি, তাই বলে সে ঔদ্ধত্য যে পদ্মাকেও লাঞ্ছনা হানতে এগুবে—এ বার্তা শুধু নতুন নয় রাজা—অদ্ভুত।

কঙ্কা : এই অতিদর্পীকে একটা অতি বড় শাস্তি না দিলে আর চলে না, রাজা!

চূর্ণী : —তোমার ব্রহ্মাস্ত্র নিশিত বজ্র, তোমার সেনাপতি পবন, তার মারণসেনা বন্যা তুফান ঝঞ্ঝা—সব প্রস্তুত তো রাজা?

মঞ্জু : হাঁ, সব প্রস্তুত বই কি? ওলো চূর্ণী, রাজার কঠিন বজ্র যে এখন শ্রামতী বিদ্যুল্লতার গলায় কোমল হার হয়ে ঝলমল করছে। বলি রাজা, তোমার হাতের বজ্র ভেঙে কি শেষে প্রিয়ার গলার হার গড়ালে? হা কপাল! যেমন রাজা, তেমনি সেনাপতি! সেনাপতি পবনদেব ওদিকে ফুল-কুমারীর মহলে মহলে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন! মালতীর কানে ফুঁ, মল্লিকার, গালে সুড়সুড়ি, কামিনীর চোখের পাতায় চুমকুড়ি, কমলের খোঁপা ধরে টান—এই তো বীরবরের কীর্তি! উপযুক্ত রাজার উপযুক্ত সেনাপতি!

মেঘ : (হাসিয়া) সত্যিই আমার সেনাপতির ধুনর্বাণ কামদেব চুরি করেছেন, মঞ্জু! আর আমার বজ্রাগ্নি লুকিয়েছে (মঞ্জুর কপোলে মৃদু অঙ্গুলি আঘাত হানিয়া) তোমাদের ঐ কালো আঁখি-কোণে!

নীরা : বেশ তো রাজা, তা হলে এ অভিযানে আর তোমার হিমালয় ছেড়ে যাবার দরকার কি? শুধু আমরাই যাই না কেন, দেখি এ আঁখির আগুনে যন্ত্ররাজ দগ্ধ হয় কি-না!

মেঘ : অমন কাজ করো না নীরা, করো না! এ হতভাগ্য, যত পুড়বে তত খাঁটি হবে, তত ওর শক্তি বাড়বে। তোমাদের আঁখির আগুনে—ওর কঠিন হিয়া গলবে না, নীরা! কত অশ্রুই না ঝরছে নিরন্তর অনন্ত আকাশ গলে ওর প্রতপ্ত ললাটে, তবু ঐ অশান্ত দৈত্য-শিশু শান্ত হল না। পুড়িয়ে ওর কিছু করতে পারবে না, আগুনই ওর প্রাণ। ওকে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নীপা : তোমায় যদি পথে পথে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারি রাজা, ঐ দৈত্যটাকে আর পারব না?

কৃষ্ণা : ওরে নীপা, আমাদের রাজা হল দেবতা—ওপরের মানুষ, তাই ওকে পল্কা হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ানো দুরূহ নয়, কিন্তু ওটা যে হল দৈত্য, তাই তো ও এত ভার! ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়েই তো ও এমন করে চোখ-

কান বুঁজে মাটি কামড়ে পড়ে আছে! তাই তো ও স্থানু। ওকে ভাসানো অত সহজ হবে না!

অশ্রু : ঠিক বলেছিস কৃষ্ণা! ফুল সুন্দর বলেই একটু ছোঁওয়ায় ঝরে পড়ে যায়, একটু ফুঁয়ে উড়ে যায়! আর ঐ দৈত্যটা কুৎসিত, তাইত ও হয়ে উঠল বোঝা, ওর আসন হল অটল। ওর পায়ে মাথা খুঁড়লে শুধু ললাটই হবে ক্ষত, আসন এক বিন্দু টলবে না!

মেঘ : দেব-দানবের এ-যুক্তি চিরন্তন, অশ্রু! ঐ মায়াবি দৈত্যটা হাজার রূপ ধরে হাজার বার আমাদের স্বর্গ আক্রমণ করেছে, প্রতিবারেই ওদের আক্রমণ আমরা প্রতিহত করেছি। আমাদের একমাত্র ভয়, ওরা ঘোর মায়াবী! কোন ছিদ্র দিয়ে যে স্বর্গপুরী প্রবেশ করবে—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদের রুপার কাঠির ছোঁওয়ায় কত রূপের পুরী পাষাণ-পুরী হয়ে উঠল। ও কাঠি যাকে ছোঁবে, সেই হয়ে যাবে জড়। ও-রুপার কাঠি যাদু জানে! ওরা যদি তাই দিয়ে একবার এ-স্বর্গ ছুঁতে পারে, তাহলে এর সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্তে পাষাণ হয়ে যাব, এর পারিজাতমালা শুকিয়ে উঠবে!

অশ্রু : তাহলে কি উপায় হবে রাজা! ও যদি আমাদের আনন্দ-পুরী ছুঁয়ে দেয়? তুমি খুব বিপুল করে প্রাচীর গাঁথ না কেন আমাদের স্বর্গ ঘিরে!

মেঘ : ওরে বাস রে! তাহলে কি আর রক্ষা আছে! ওরা তো তাই চায়। তারই জন্যে তো ওরা আমাদের নিরন্তর রাগিয়ে তুলছে। প্রাচীর তুললেই তো ওদের ভাঙবার পশুত্বটাকে প্রচণ্ড করে তোলা হবে। আমরা একটা কিছু আড়াল তুললেই ওরা সেইটে অবলম্বন করে উঠে আসবে স্বর্গে। অবলম্বন পাচ্ছে না বলেই তো ওরা মাঝপথ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছে, এ স্বর্গলোকের সীমা খুঁজে পাচ্ছে না।

চম্পা : কিন্তু রাজা গন্ধর্বলোক তো প্রাচীর তুলেই ওদের আক্রমণ প্রতিহত করতে চাচ্ছে।

মেঘ : মূর্খ ওরা, তাই ওদের আজ কি দুর্দশা হয়েছে দেখ। যন্ত্ররাজের যে পথ কিছুতেই মাটি ছাড়িয়ে উঠতে পারছিল না, দেয়াল তুলে গন্ধর্বলোক সেই পথকে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। ঐ দেয়াল ধরেই ওরা ওদের ওপর এসে পড়েছে দলে দলে।

মন্দা : রাজা, এইবার যদি ওরা স্বর্গে এসে পড়ে?

মেঘ : ভয় নেই মন্দা। আমাদের এ অলখ-পুরীর দশ দিক মুক্ত। তাই তো ওরা দিশাহারা হয়ে পড়েছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বন্ধদ্বার দুর্গেই পড়ে শত্রুর পরিপূর্ণ আক্রোশ। আড়ালের ইঙ্গিতে শত্রুকে আহ্বান করার মতো দুর্বুদ্ধি আর নেই। নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দেখ, কি বীভৎস ঐ যন্ত্রী-সেনা—ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহা, চুন, সুরকি, ধুলো-বালি!—ওদের সংখ্যা করা যায় না—

কেবল স্তূপ আর স্তূপ! প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে! সব প্রাণহীন! আর প্রাণহীন বলেই অন্যের প্রাণে মারতে ওদের বাজে না! ঐ দেখ, গন্ধর্বলোকের প্রাচীর ধরে ওরা কি রকম ছেয়ে ফেলছে ওদের দেশ—মারীভয়ের মতো। এ সুবিধা যদি না করে দিতে গন্ধর্বলোক, তাহলে ও পাপ অন্ধকারের নিচেই পড়ে থাকত মুখ থুবড়ে।

চিত্রা : কিন্তু রাজা, যন্ত্ররাজের ঐ সেতু-বন্ধকে এত ভয়েরই বা হেতু কি? অমনি সেতুবন্ধ দিয়েই তো সীতার উদ্ধার হয়েছিল!

মেঘ : উদ্ধারই বটে, চিত্রা! ঐ সেতুবন্ধে পদার্পণের পাপে আগুনে পুড়েও সীতার কলঙ্ক পুড়ল না—শেষে পাতাল প্রবেশ করে উদ্ধার খুঁজতে হল।

রেবা : বুঝেছি রাজ, সকল বন্ধন ও বন্ধনী হতে মুক্ত রাখাই হয় তো আমাদের স্বর্গপুরীর শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা!

মন্দা : আচ্ছা রাজা, যন্ত্ররাজের এই সেতুবন্ধের উদ্দেশ্য কি?

মেঘ : এই সেতুবন্ধ যে পাতালপুরীর সীতার উদ্ধার করবে না মন্দা, ও করতে চায় স্বর্গলক্ষ্মীকে বন্দিনী। ঐ সেতুবন্ধ স্বর্গ-প্রবেশের লঙ্ঘন-সোপান। ঐ সেতুবন্ধের লৌহ-বর্ম দিয়ে সে স্বর্গলক্ষ্মীর কেশাকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যাবে—তাই বলে তার সমুদ্ধত কৃষ্ণ-পতাকা!

কৃষ্ণা : তাহলে ওকে দুঃশাসনের মতো মারও খেতে হবে, রাজা!

মেঘ : ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, অনাগত সে দিন এলো বলে। এখন চল, পদ্মা দেবীর নিরাশা-শুষ্ক কূল পানে। যন্ত্রপাতির আয়োজন দেখে তারপর সেনাপতি পরন-দেবকে খবর দেওয়া যাবে। সে ততক্ষণ ফুলমহলায় বিশ্রাম করে নিক।

(নৃত্য-গান করিতে করিতে মেঘ ও বৃষ্টি-ধারার প্রস্থান।)

হাজার তারার হার হয়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে॥

'বৌ কথা কও' বলে পাখি
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি
নামি বধূর নয়ন-জলে॥

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,

নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরি।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ করে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলা-পটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে॥

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ যন্ত্রপাতির রাজসভা। বিশাল লৌমঞ্চে বিশালকায় যন্ত্রপাতি উপবিষ্ট। পশ্চাতের আঁধার-কৃষ্ণ যবনিকা জুড়িয়া ভীতপ্রদ রক্তাক্ত অট্টালিকার পর অট্টালিকা—জীবজন্তু-তরুলতা-পরিশূন্য। বিরাট অমঙ্গলের প্রতীকসম উর্ধ্বে প্রসারিত-পক্ষ বিপুল শকুনি—ভীষণ দৃষ্টিতে নিম্নে চাহিয়া আছে। যন্ত্রপাতির কঠিন মুখে রক্ত আলো পতিত হইয়া তাহাকে আরো ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। মস্তকে লৌহ-মুকুট। মুকুটমণি—ইলেকট্রিক-টর্চ। সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া লৌহ-জালীর সাঁজোয়া। দক্ষিণ করে স্থূল লৌহদণ্ড, বামকরধৃত দীর্ঘ শৃঙ্খলে বদ্ধ ক্ষুধিতদৃষ্টি সিংহ, হিংস্রমতি শার্দুল, শাণিত-নখর ভল্লুক ও কুটিল-ফণা ভুজঙ্গী—পদতলে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। প্রসাদ চূড়ায় কৃষ্ণপতাকায় 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' কাটিয়া তাহারি নিচে লেখা হইয়াছে—'বিদ্বেষ শোষণ পেষণ !' ]

'যন্ত্র'—বিপুল স্থূলকায়, কদাকার, অন্ধদৃষ্টি। বড় বড় নখদন্ত। দক্ষিণ হস্তে জাঁতাকল, বাম হস্তে প্রকাণ্ড সিগার—বেয়াদবের মতো তাহারই পুঞ্জীভূত ধূম মুখ দিয়া অবিরত বাহির করিতেছে। মস্তকে চিমনি-আকৃতির লম্বা টুপি। পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া বিরাট চক্র। রক্ত-বস্ত্র, রক্ত-দেহ। তাহার পৃষ্ঠে চক্রের সাথে সাথে সেও অনবরত ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

ইঁট, কাঠ, পাথর, যেন নেশা খাইয়া ঝিমাইতেছে ! কেবল লৌহের উজ্জ্বল কঠিন-দৃষ্টি।

ইঁটের পরনে পিরান ও সুর্কি-রং চাহারখানার ঢিলে আরবি পায়জামা। মাথায় লালরঙা চৌকো, টুপি, খর্বকায়, অলস-দৃষ্টি সিমেন্ট-রং-রঞ্জিত মুখ ! পায়ে চৌকো বুট।

কাঠ। স্থূল কর্কশ বস্ত্র শীর্ণকায় দীর্ঘাকৃতি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বিশুষ্ক মুখ। শির নাঙ্গা। ম্লান দৃষ্টি, নখ চুল বড় বড়।

পাথর—মুখ চোখ বস্ত্র ধূমল বর্ণ। স্থূল কদাকার, কতকটা কচ্ছপের মতো। যেন শুধু পেট আর মাথা। শিরে জবড়জং কৃষ্ণ-উষ্ণীষ। হাত পা ভারি ভারি। মুখ চ্যাপটা, চোখ ছোট।

লোহা। আলকাতরা-রং—দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ-দেহ, কঠোর-দৃষ্টি, বদ্ধ-দৃষ্টি, বদ্ধ-মুষ্টি তিক্ত-কণ্ঠ। আঁট-সাট জামা।

[ যন্ত্র, ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বন্দনাগীত গাহিতেছে। ]

গান

নমো হে নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত।
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত॥
বিশ্ব হল বস্তুময়
মন্ত্রে তব হে,
নন্দন-আনন্দে তুমি
গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত॥

শঙ্কর হে, সে কোন সতী-শোকে হয়ে নৃশংস
বসেছ ধ্যানে, হয়েছ জড়, সাধিতেছে এ ধ্বংস।
রুক্ষ তব দৃষ্টি-দাহে
শুষ্ক সব হে,
ভীষণ তব চক্রাঘাতে
নির্জিত যুগান্ত॥

যন্ত্র : আর ত আমাদের পথ এগোয় না রাজা, সামনেই খরস্রোতা পদ্মা—স্বর্গের নিষেধ-বাণীর মতো।

যন্ত্রপাতি : ওকে ওর গতি লঘু করতে বল!

যন্ত্র : জানি রাজা, বহু স্রোতস্বতী তোমার আদেশ পালন করেছে, কিন্তু পদ্মা তাদের সম্রাজ্ঞী।

যন্ত্রপাতি : তুমি ভুলে যাচ্ছ সেনাপতি যে, আমিও সম্রাট। ওকে বল—এ আমার আদেশ!

যন্ত্র : যে-মন্দাকিনী ইন্দ্ররাজের ঐরাবতকে তৃণকণার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এ তারই জ্যেষ্ঠা কন্যা। তার তরঙ্গ-সেনার হুহুঙ্কারে প্রলয়-নর্তনে ধরণী প্রকম্পিত!

যন্ত্রপাতি : ধরণী প্রকম্পিত হতে পারে—আমি নয়। ওকে খবরটা পৌঁছে দাও—ওর বুকের ওপর দিয়ে প্রস্তুত হবে আমার পথ!

যন্ত্র : সে খবর সে শুনেছে, রাজা। তার তরঙ্গ-সেনা পর্যন্ত এ খবর শুনে ফেনা ছুঁড়ে বিদ্রূপ করে।

ইট : মনে হয়, যেন গায়ে থুথু দিয়ে অপমান করলে!

যন্ত্র : আরে বাপু, তুমি থাম!—রাজা, এ অভিযানে তোমায় অধিনায়কত্ব করতে হবে।

যন্ত্রপাতি : তুমি কি ওর হাঙর-কুমির দেখে ভয় পেয়ে গেলে সেনাপতি?

যন্ত্র : না রাজা, আমার ভয় শক্ত-কিছু নিয়ে নয়, ভয় আমার ঐ তরল তরঙ্গ সেনাকে। ও যদি কামড়াত, তাহলে আমার ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু ও তো কামড়ায় না—শুধু সমস্তক্ষণ ঠেলে। ধরতে গেলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে যায় গলে !

পাথর : আজ্ঞে, বেটা একে মনসা, তাতে আবার ধুনোর গন্ধ ঐ পবন ব্যাটা ! ও যখন এসে যো দেয়, তখন আমার এই কাবুলি বপুখানিকেও তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ে !

ইঁট : আজ্ঞে, আর আমাকে তো সুর্কি-গুঁড়ো করে দেয় !

কাঠ : আমার খাতির ততোধিক ! কান ধরে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে খাওয়াতে যখন দেয় রাম-ছুট, তখন দুপাশের লোক বলে—মড়া ভেসে যাচ্ছে।

লোহা : (সগর্বে) আমি বরং গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মরি, তবু ওদের মতো ভেসেও যাই না, ভেঙেও পড়ি না।

পাথর : হাঁ, তাই থাপ্পড় কষিয়ে তোমার মুখটা দেয় নয়ের মতো করে বেঁকিয়ে—তারপর বেশ করে বালি চাপা দিয়ে—দেয় জ্যান্ত কবর।

যন্ত্র : চুপ কর সব !—তোমাদের সমবেত শক্তি দিয়ে ওকে প্রতিরোধ করতে হবে—একলা যে যাবে তাকেই অকূলে ভাসতে হবে !

কাঠ : ভাসতে হয় তো সকলেই হবে সেনাপতি, তবে এবার সকলে একসাথে ভাসব—এই যা সান্ত্বনা ! বাবা, পদ্মার যে চেহারা দেখে এসেছি তা মনে করলে এখনো কাঠ হয়ে যেতে হয় ! স্রোত তো নয়—যেন লাখে লাখে পাহাড়ে অজগর ফোঁসাচ্ছে-মোচড় খাচ্ছে। তারপর কুমিরগুলো যেন খেজুর-গুঁড়ির ঢেঁকি। (অন্য দিকে চাহিয়া) হাঙরগুলোর মুখ কিন্তু আমাদের সেনাপতিরই মতো।

যন্ত্র : দেখ, তুমি বড় হালকা। তোমাদের দুর্বলতার রাজা ক্রুদ্ধ হচ্ছেন।

যন্ত্রপাতি : সেনাপতি, আমি এখন চললাম। তোমরা প্রস্তুত হও—পদ্মাকে শাসন করতেই হবে। [প্রস্থান]

পাথর : আচ্ছা সেনাপতি, রাজার অত আক্রোশ কেন ঐ জলধারার ওপর? ওকে কি না বাঁধলেই নয়? আমরা ওকে কি ডিঙিয়ে যেতে পারিনে? তা হলে খাসা হত কিন্তু ! ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। তখন একবার দেখে নিতাম—ওর তরঙ্গ-সেনা কত লাফাতে পারে? আমরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালে বোধ হয় ওকে আলগোছে ডিঙিয়ে যেতে পারি।

যন্ত্র : সে চিন্তার ভারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। তোমাদের যা বলি তাই, কর এখন।—আমাদের যন্ত্রপাতি স্বর্গ জয় করতে চান, তাঁর যন্ত্ররথের পথের বাধা ঐ বিপুল স্রোতধারা—ও যেন স্বর্গের গড়খাই—ওর তরঙ্গ যেন স্বর্গের সীমান্তরক্ষী সৈন্য। ওকে জয় করতে পারলেই স্বর্গজয় সহজ হয়ে উঠবে।

ইঁট : স্বর্গের সরস্বতীকে তো আগেই বন্দী করেছি সেনাপতি, তার বীণার তারকে বেতার-যন্ত্রের কাজে লাগিয়েছি—তাঁর পদ্মবনকে করেছি কাঠ-গুদাম! স্বর্গে আর আছে কি?

যন্ত্র : (পাথরের প্রতি) দেখ, তোমায় ভারিক্কি বলেই জানতাম—তোমাতেও দেখছি হালকা কাঠের ছোঁয়াচ লাগল!—(কাঠের প্রতি) দেখ, তোমার হালকা হওয়ায় কিন্তু একটা সুবিধাও আছে। তোমায় তরঙ্গ সহজে ডুবাতে পারে না। ভেসে এক জায়গায় কূলে ঠেকবেই।

পাথর : আজ্ঞে, ডুবলে কিন্তু ভরাডুবি।

যন্ত্র : আঃ, থাম তুমি! (কাঠের প্রতি) দেখ, তোমায় নৌকা হয়ে দেখে আসতে হবে—কোথায় পদ্মার তরঙ্গ-সেনা উদাসীন, কোথায় ওর গতিবেগ লঘু।

লোহা : আচ্ছা সেনাপতি, পদ্মাকে কি বন্দিনী করবে?

যন্ত্র : —না। তা করতেও পারব না, আর পারলেও করতাম না। আমরা পদ্মাকে চাই না—চাই স্বর্গ-লক্ষ্মীকে। এই স্রোতের জল সেই স্বর্গের প্রাণধারা। এই প্রাণধারার গতিবেগ সংযত করা ছাড়া একেবারে বন্ধ করলে যার জন্যে এই অভিযান, হয়-ত সেই স্বর্গলক্ষ্মীকেই হারাব—এবং পাব দক্ষ-যজ্ঞের সতীকে! আমাদের রাজমন্ত্রী কৌটিল্যকে তা হতে দেবেন না।

কাঠ : কই সেনাপতি, মন্ত্রী কৌটিল্যকে তো দেখতে পেলুম না কখনো।

যন্ত্র : সবচেয়ে মূল বাণ যে, তাকে রাখতে হয় সবচেয়ে গোপনে। মন্ত্রী কৌটিল্যই হল আমাদের রাজ্য-রক্ষার রক্ষাকবচ। আমরা সকলে, মায় রাজা পর্যন্ত, ঐ কৌটিল্যেরই অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

পাথর : ঠিক বলেছ সেনাপতি দুর্বুদ্ধি, যিনি, তিনি থাকেন দেখার অতীত হয়ে। ষড়যন্ত্রকে দেখতে যাওয়া দুরাশা!

ইঁট : আমারও তাই মনে হয়, সেনাপতি, জগৎটাকে সৃষ্টি যেই করুক—ওর মালিক যেই হোক—ওকে চালায় কিন্তু শয়তান।

যন্ত্র : ওহে, তোমাদের কথাবার্তায় রাজদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছি। রাজার এবং ভগবানের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করলে তার শাস্তি কি, জান?

কাঠ : জেল কিংবা নরক।—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ!

যন্ত্র : এই! চুপ! চুপ! ঐ রাজা আসছেন, শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

যন্ত্রপাতি : সেনাপতি! আজই যাত্রা কর পদ্মাতীরে তোমার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। সৈন্য পরিচালনের ভার আমিই গ্রহণ করব। (ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহার প্রতি) প্রিয় সৈনিকগণ। তোমাদেরি আত্মদানে আমার এই বিশাল সাম্রাজ্য। এর যা কিছু গৌরব, যা কিছু প্রতিষ্ঠা—সব তোমাদেরই।

আমাদের এ যুদ্ধ স্বর্গমর্ত্যের চিরন্তন যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জড় ও জীবের, বস্তু ও প্রাণের, মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়ের। অমৃতে আমাদের অধিকার নেই, তাই আমরা অমৃতকে তিক্ত করে তুলতে চাই! যে-বেদনায় আজ মহাজড়, সেই বেদনার বিক্ষোভে দেবতার আনন্দকে পঙ্কিল করে তুলতে চাই। প্রকৃতিকে আমরা বশীভূত করেছি—এইবার স্বর্গরাজ্য জয়ের পালা। আমাদের পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ঐ মুক্ত স্রোতস্বতী—আনন্দলোকের গোপন প্রাণ-ধারা। ওকে বাঁধব না—ওর বুকের ওপর দিয়ে চলে যাব আমাদের চলার চিহ্ন এঁকে।—স্বর্গের আনন্দ-লক্ষ্মী করবে এই জড়-জগতের পরিচর্যা—এই দম্ভের দীপ্ত তিলক তোমরা পরাও এই মর্ত্য-লোকের লাঞ্ছিত ললাটে। অহঙ্কারের এই উদ্ধত পতাকা স্বর্গের বুকে প্রতিষ্ঠা কর, বীর!

সকলে : জয় যন্ত্রপতি কি জয়! জয় যন্ত্রপতি কি জয়!!

যন্ত্র : সৈন্যগণ, গাও আমাদের সেই যাত্রাপথের কুচ-কাওয়াজের গান!

গান

চরণ ফেলি গো মরণ ছন্দে
মথিয়া চলি গো প্রাণ।
মর্ত্যের মাটি মহীয়ান করি
স্বর্গেরে করি ম্লান॥

চিতার বিভূতি মাখিয়া গায়
লজ্জা হানি গো অন্নদায়,
বাঁধিয়াছি বিদ্যুল্লতায়,
দেবরাজ হতমান॥

পাতাল ফুঁড়িয়া করি গো মাতাল
রসাতল-অভিযান॥

## তৃতীয় দৃশ্য

[ সিংহাসনারূঢ়া মকর-বাহিনী পদ্মা। পরনে জল-তরঙ্গ শাড়ি, হাওয়ায় কেবলি ঝিলমিল করিতেছে। গায়ে কাঁচা রৌদ্র-কিরণের উড়ুনি। কাশ-বন চামর ঢুলাইতেছে। বেলা-ভূমে হাঙর কুম্ভীর প্রহরীর কার্য করিতেছে। দুই তীরে বালুচরের শ্বেত পর্দা ঝুলানো। অগণিত মীন-সেনা সিংহাসনের চারি পাশে পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। জলদেবীগণ বন্দনা-গান গাহিতেছে। ]

গান

নমো নমো নম হিম-গিরি-সূতা
দেবতা-মানস-কন্যা।
স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায়
মর্ত্যে করিলে ধন্যা॥

আছাড়ি পড়িছ ভীষণ রঙ্গে
চূর্ণি পাষাণ ভীম তরঙ্গে,
কাঁপিছে ধরনী ভ্রূকুটি ভঙ্গে,
ভুজঙ্গ-কুটিল বন্যা॥

কূলে কূলে তব কন্যা কমলা
শস্যে-কুসুমে হাসিছে অচলা,
বন্দিছে পদ শ্যাম-অঞ্চলা
ধরনী ঘোরা অরণ্য॥

[ জলদেবীদের নাম—তরঙ্গিণী, সলিলা, অনিলা, তটিনী, নির্ঝরিণী, বালুকা। ]

পদ্মা : তোদের এ গান থামা, তরঙ্গিণী। এ বন্দনা-গান আজ আমার গায়ে বিদ্রূপের মতো বিঁধছে!

তরঙ্গিণী : জানি মা, তোমার বেদনা কত বিপুল। কিন্তু যন্ত্রপতির এ স্পর্ধার দণ্ড কি আমরা দিতে অসমর্থ, মা?

পদ্মা : আপাতত তো তাই মনে হচ্ছে তরঙ্গিণী। কত বাধাই না দিলাম। যন্ত্রপতির অগণিত সেনা-সামন্ত আজো আমার বালুচরের তলে তাদের সমাধি রচনা করে পড়ে রয়েছে, তবু তো তাকে আটকে রাখতে পারলাম না। সে আমার বুকের ওপর দিয়ে তাঁর উদ্ধত যাত্রা-পথ করে গেল। (আদুরে সেতু-বন্ধ দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ দেখেছিস তার সেতু-বন্ধ? ও যেন কেবলি আমার মাথার ওপর চড়ে বিদ্রূপ করছে! অসহ্য তরঙ্গিণী, অসহ্য এ অপমান!

সলিল : কি চতুর ঐ যন্ত্রপতিটা, মা! কাপুরুষ—আমাদের ভয়ে আমাদের নাগালের বাইরে ওর পথ রচনা করেছে। পেতাম ওকে তরঙ্গের মুখে, তা হলে ওর ঐ আকাশস্পর্শী স্পর্ধার মুখের মতো শাস্তি দিয়ে ছাড়তাম।

বালুকা : তাহলে এতদিন ঐ বালুচর হত ওর সমাধি।

পদ্মা : যুদ্ধজয় শুধু শক্তি দিয়ে হয় না, সলিলা, শক্তির চেয়ে বুদ্ধিরই বেশি প্রয়োজন বড় যুদ্ধে।

অনিলা : আচ্ছা মা, ওর পথ না হয় আমাদের নাগালের উর্ধ্বেই রইল, কিন্তু ও-পথের মূল তো রয়েছে আমাদেরি বুকের ওপর প্রোথিত। সে-মূলকে কি আমরা উপড়ে ফেলতে পারিনে?

পদ্মা : আমার শক্তিহীন তরঙ্গ-সেনাকে সে কথা জিজ্ঞেস কর অনিলা। সে চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমবার—প্রথমবার কেন, বহুবারই আমরা তাদের ও পথমূলকে উচ্ছেদ করেছি, কিন্তু আর পারা গেল না। ওর বিপুল ভারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি আর আমার তরঙ্গ-সেনার রইল না।

নির্ঝরিণী : আচ্ছা, মা আমরা তো পারলাম না। কিন্তু আমাদের এ-অপমান—এই পরাজয় দেখে স্বর্গের দেবতারা কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন, তাই ভাবছি। তুমি আকাশের দেবতাদের আহ্বান কর না একবার!

পদ্মা : আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যও চেয়েছি, নির্ঝরিণী। দেবরাজ তাঁর মেঘ-রথে চড়ে দেখেও গেছেন সব। তিনিও যে যন্ত্রপতির এই অতি বিপুল স্থূলকায় দেখে বিস্মিত—হয়ত বা ভীতও হয়েছেন। আমার মরাল-দূতী এই সেদিন ফিরে এসেছে। তিনি বলেছেন, এর জন্য তাঁকে বড় রকম প্রস্তুত হতে হবে। পরাজয়ের লজ্জাকে তাঁর অতিমাত্রায় ভয়!

তটিনী : কিন্তু মা, অসুরের হাতে দেবরাজের পরাজয় তো বহুবারই হয়ে গেছে।

পদ্মা : বারে বারে পরাজিত হয়েই তো তাঁর এত ভয়, তটিনী ! তাঁর পরাজয়ের পথ অনুসরণ করে যদি অসুরের দল আবার স্বর্গ আক্রমণ করে !

[ হঠাৎ ঊর্ধ্বে মেঘের দামামা-ধ্বনি শোনা গেল। পদ্মাদেবী উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। ]

পবন : (হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া) দেবী ! স্বর্গে দামামা বেজে উঠেছে। আমার অগ্রজ দেবরাজ সেনাপতি ঝঞ্ঝা তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে পড়লেন বলে। আদেশ দিন দেবী, আমি আমাদের সৈন্য-সামন্তদের প্রস্তুত হতে বলি।

পদ্মা : (উত্তেজনায় দণ্ডায়মান হইয়া) তুমি প্রস্তুত হও সেনাপতি ! এখনি তরঙ্গ-সেনাদলকে কুলে কুলে দামামা-ধ্বনি করতে বল। সকলে যেন তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকে। আমি দেবরাজ সেনাপতিকে অভ্যর্থনা করে আনি। জয় মা ভবানী ! (পদ্মা শ্বেতমরালীর ডানায় চড়িয়া ঊর্ধ্বে উড়িয়া গেলেন। তরঙ্গ-সেনা, হাঙর, কুমির, মীনদল, জলদেবীগণ অতি ব্যস্ততা-সহকারে বাহির হইয়া গেল। পশ্চিম গগন অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণমেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে মেঘ সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঊর্ধ্বে ভীষণ শনশন শব্দে ঝঞ্ঝা আসিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মার জল সম্ভ্রমে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যেন দেবরাজ সেনাপতিকে অভি-বন্দনা জ্ঞাপন করিল।)

[ ঝঞ্ঝার উচ্ছৃঙ্খল ঝামর-কেশ। ত্রস্ত স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া ধরায় লুটাইয়া পড়িতেছে। হস্তে ধূলি-গৌরিক পতাকা। কর-খর্পরে ধূমায়িত অগ্নি। বক্ষদেশে বিদ্যুতের যজ্ঞোপবীত। চরণে খর-ধ্বনি নূপুর। নয়নে বহ্ন্যগ্নি-জ্বালা। বাহুতে ছিন্ন শৃঙ্খল। দিগন্ত-ছাওয়া কুটিল ভ্রু-ভঙ্গি। নিযুত বাসুকি কোটি ফণা বিস্তার করিয়া ছত্র ধরিয়াছে। তাহাদের নিঃশ্বাসের শব্দে স্বর্গ-মর্ত্য শিহরিয়া উঠিতেছে।—যেন দ্বিতীয় প্রলয়ের শঙ্কর। ]

অন্তরীক্ষে গান

হর হর শঙ্কর ! জয় শিব শঙ্কর !
দানব-সন্ত্রাস জয় প্রলয়ঙ্কর !
জয় শিব শঙ্কর ॥

নিপীড়িত জন-মন-মন্থন দেবতা,
আন অভয়ঙ্কর স্বর্গের বারতা !
জাগো মৃত্যুঞ্জয় সংঘাত-সংহর।
জয় শিব শঙ্কর ॥

এস উৎপীড়িতের রোদনের বোধনে
বজ্রাগ্নির দাহ লয়ে রোজ-নয়নে॥

ভীম কৃপাণে লয়ে মৃত্যুর দণ্ড
দৈত্যেরি-বেশে এস উন্মাদ চণ্ড,
ধ্বংস-প্রতীক মরু-শ্মশান-সঞ্চর !
জয় শিব শঙ্কর॥

[ ঊর্ধ্বে ঝঞ্ঝা, পদ্মা, বজ্রশিখা, মেঘ, পবন। নিম্নে তরঙ্গ-সেনা, সেতু, জলদেবীগণ, মীনকুমারিগণ, ভারবাহী পশু ও মানুষ, পীড়িত মানবাত্মা। ]

ভারবাহী মানুষ : (অন্তরীক্ষ লক্ষ্য করিয়া) জাগো দেবতা ! আর এ ভার বইতে পারিনে। যন্ত্র-রাজা আমাদের ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে আমাদের সর্বস্ব হরণ করেছে। আমাদের আত্মাকে হত্যা করে আমাদের পশু করে তুলেছে। আমাদের পিঠ হয়েছে কুব্জ, আমাদের দেহ হয়েছে রোগ-জীর্ণ, খর্ব। আমাদের কর্তব্য হয়েছে ওদের ভার বহন। জাগো দেবতা, জাগো !

ভারবাহী পশু : জাগো রুদ্র জাগো ! নিপীড়িত কুলিরও অধম হয়েছি আমরা। যন্ত্ররাজের পশুত্ব আমাদেরও নিচে গিয়ে পৌঁছেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ আমরা। আমরা দিবসে হই তার ভারবাহী, নিশীথে হই ক্ষুধার আহার্য। জাগো রুদ্র, এই অপমৃত্যুর হাত হতে আমাদের রক্ষা কর !

পদ্মা : ঐ শোনো, শোনো দেবরাজ-সেনাপতি ! নিম্নে পীড়িত মানবাত্মা, ভারবাহী পশুর ক্রন্দন-ধ্বনি। আমারই কূলে ওরা ওদের শান্ত নীড় রচনা করেছিল। যন্ত্রপতি ওদের ধরে আমারই সর্বনাশ করিয়েছে। হানো তোমার বজ্রাঘাত, আর আমি সইতে পারিনে !

ঝঞ্ঝা : মাভৈ ! ভয় নাই দেবী। যন্ত্ররাজের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। ওকে আরও অগ্রসর হতে দিতে দিলে আমাদের স্বর্গের সদর-দ্বারে গিয়ে সে হানা দিবে। আমি বিধাতার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছি। (বজ্রকে দেখাইয়া) ঐ দেখ তার মৃত্যুদণ্ড—জ্বলন্ত অগ্নি-শিখায় লিখা !—পবন !—মেঘরাজ !—তরঙ্গসেনা !—বন্যাধার ! সকলে প্রস্তুত তো ?

[ ঊর্ধ্বে ও নিম্নে সমবেত কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সেতু-বন্ধ কাঁপিয়া উঠিল। ]

এইবার আমাদের প্রলয়-নাচের পালা শুরু হোক। ... দেবী ! তুমি নিম্নে গিয়ে তোমার তরঙ্গ সেনা বন্যাধারা পরিচালিত কর। ... পবন ! তুমি তোমার পরিপূর্ণ

গতিবেগ নিয়ে সেতু-বন্ধের ঊর্ধ্বদেশ আক্রমণ কর। বন্যা-ধারাকে, তরঙ্গ-সেনাদলকে পশ্চাতে থেকে শক্তি দাও, সাহস দাও, পরিচালিত কর, ওদের মাঝে আরো আরো গতিবেগ সঞ্চারিত কর। মেঘ! তুমি সাগর শূন্য করে সকল গিরি-শির রিক্ত করে জলধারা বর্ষণ কর! তরঙ্গ-সেনা তোমার শক্তিতে, অধীর উন্মাদনায় উন্মত্ত ফেনায়মান হয়ে উঠুক! ... বজ্রশিখা! তুমি তোমার অগ্নিদণ্ড নিয়ে সেতু-বন্ধের শিরোদেশে, পদমূলে আঘাতের পর আঘাত কর।—ধরণীধর বাসুকীকে খবর দাও, সে তার ফণা আস্ফালন করে ধরণীকে কাঁপিয়ে তুলুক। ভেঙে ফেলুক ঐ অসুরের দম্ভ সেতু-বন্ধ!

[ ঊর্ধ্বে নিম্নে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল—'জয় গন্ধর্ব-লোকের জয়! জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়! জয় মা ভবানী! জয় শঙ্কর! ... পৃথিবী টলমল করিয়া উঠিল। ঘন ঘন বজ্রপাত ও অবিরল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পদ্মার ঢেউ ভীম নর্তনে দুই কূল প্লাবিয়া তুলিল। তরঙ্গ-সেনাদলের গিরি-মাটি-রাঙা উত্তরীয় পবন-বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। জলদেবীগণ, মীনকুমারিগণ, হাঙর, কুমির—সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সকলে সেতুবন্ধে আঘাত করিতে লাগিল। ক্রমে শত শব ভারবাহী মানুষ ও পশুর দল হাতুরি শাবল গাঁইতি এবং শৃঙ্গ লইয়া সেতু-বন্ধকে আক্রমণ করিল। সেতুবন্ধ কাঁপিয়া উঠিল। ]

সেতু : জয়, যন্ত্ররাজের জয়! সাবধান স্বর্গ-বিলাসীর দল! ও-আঘাত আমার অচেনা নয়। বহুবার ওর শক্তি পরীক্ষা করেছি। (হঠাৎ বজ্রাঘাতে টলমলায়মান হইয়া) উঃ! যন্ত্ররাজ! আর পারিনে। দেবতাই বুঝি জয়ী হল!

(বাষ্পরথে সসৈন্যে যন্ত্ররাজের আগমন)

যন্ত্ররাজ : জাগো যন্ত্ররাজ-সেনা, জাগো! আজ স্বর্গের চক্রান্তকে চিরদিনের মতো ব্যর্থ করতে চাই। আজকার জয় দিয়ে স্বর্গরাজ্য জয়ের কল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে হবে। জাগো যন্ত্রী, জাগো সেনাদল!

[ ইঁট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি যন্ত্ররাজ-সেনার ও সেনাপতি যন্ত্রের ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ... দেবাসুরের ভীষণ রণ-কোলাহল ক্লেদে ধরণী আকাশ পঙ্কিল ধূম্রাক্ত হইয়া উঠিল। ]

ঝঞ্ঝা : কোথায় নিশিত পাশুপতাস্ত্র! জাগো! দেবতার উদ্যত দণ্ড হয়ে যন্ত্র-রাজের বক্ষ ভেদ কর। সাবাস! (পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ ও যন্ত্ররাজের পতন। সঙ্গে সঙ্গে সেতুবন্ধও ভীষণ শব্দে পদ্মা-গর্ভে নিপতিত হইল।)

পদ্মা : জয় মা ভবানী। জয় দেব-শক্তির! গন্ধর্ব-লোকের জয়! (যন্ত্র-রাজের বুকে ত্রিশূল হানিয়া) আজ হতে মর্ত্যে পশুর রাজত্বের অবসান হল। [ যন্ত্ররাজের বিকট আর্তনাদে আকাশ যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল ]

ঝঞ্ঝা : জয় দেবরাজ ইন্দ্রের! জয় মন্দাকিনী-সূতা পদ্মাদেবীর! আজ গন্ধর্ব-লোকের সাথে স্বর্গও অসুর-ত্রাস থেকে মুক্ত হল। জয় শিব শঙ্কর!

[ তরঙ্গ-সেনাদল দলে দলে আসিয়া পতিত সেতু-বন্ধের উপর পড়িয়া তাহাকে গ্রাস করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিপুল সেতু-বন্ধ পদ্মা-গর্ভে লীন হইল। উৎক্ষিপ্ত

তরঙ্গ-দল গগন-চুম্বন-প্রয়াসী হইয়া উঠিল। ... দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া গিয়া পূর্ব গগন রাঙ্গ-রঙ্গা রামধনু-শোভিত হইয়া উঠিল। অস্তপাট সোনার গোধূলি-রঙে রাঙিয়া উঠিল। সূর্যদেব সহস্র কর বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে আশির্বাদ করিলেন। পদ্মা তরঙ্গ-শিরে একরাশ ছিন্ন শতদল হইয়া স্বর্গের পানে তুলিয়া ধরিলেন, ঝঞ্ঝার ধূর্জটি-কেশে পরাইয়া দিলেন। দূর মেঘ-লোকে বিজয়-দামামা-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। ]

যন্ত্র : (মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে) আমার মৃত্যু নাই। দেবী! আজ তোমারই জয় হল। দেবতার মতো দানবও বলে, —'সম্ভবামি যুগে যুগে।' আমি আবার নতুন দেহ নিয়ে আসব। আবার তোমার বুকের ওপর দিয়ে আমার স্বর্গজয়ের সেতু নির্মিত হবে।

পদ্মা : জানি যন্ত্ররাজ! তুমি বারেবারে আসবে, কিন্তু প্রতিবারেই তোমায় এমনি লাঞ্ছনার মৃত্যু-দণ্ড নিয়ে ফিরে যেতে হবে।

## যবনিকা

# শিল্পী

## প্রথম দৃশ্য

[রোগ-শয্যায় শায়িতা লায়লি—অস্তমান সপ্তমীর চাঁদের মতো ক্ষীণপ্রভ। গভীর অন্ধকার রাত্রি। শিয়রে বিমলিন-জ্যোতি তৈল-প্রদীপ আর চিত্র-অঙ্কনরত স্বামী।]

লায়লি : তোমার ছবি আঁকা হল?—(চিত্রকর নীরবে-একমনে ছবি এঁকে চলছে)—ওগো শুনছ?

চিত্রকর : (চমকে উঠে) অ্যাঁ! আমায় ডাকছিলে লায়লি?

(লায়লি অভিমানে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে চোখের জল গোপন করল। চিত্রকর আবার একমনে চিত্র আঁকতে লাগল)

লায়লি : (পাশ ফিরে গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস মোচন করে) দোহাই! তুমি অন্য ঘরে ছবি আঁক গিয়ে! আমার বড্ডো বিশ্রী লাগছে! (শেষের কথা কয়টা বলতে কান্নায় তার স্বর ভেঙে পড়ল)

(চিত্রকরের হাত হতে তুলি পড়ে গেল—লায়লির কান্না-দীর্ণ স্বরের তীব্রতায়)

চিত্রকর : (সবিস্ময়ে) লায়লি! তুমি কাঁদছ?

লায়লি : (তীব্রস্বরে) না! রহস্য করছি! তুমি একটু অন্য ঘরে উঠে যাবে? দয়া করে আমায় একটু একলা থাকতে দাও!

চিত্রকর : (উদাসীনভাবে) আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তোমার রোগ-যন্ত্রণা আর বাড়াতে চাইনে তোমার কাছে থেকে। (চলে যাবার উপক্রম করল।)

লায়লি : যেয়ো না। দুটো কথা আছে, শুনে যাও।

চিত্রকর : (বসে পড়ে) বল।

লায়লি : ওখানে না। আমার পাশে এসে বস।

চিত্রকর : (লায়লির পাশে বসে) বল। (আনমনে লায়লির কপোল ও ললাট হতে অলকগুচ্ছ তুলে দিতে লাগল।)

লায়লি : সত্যি করে বল দেখি, তুমি বিয়ে করেছিলে কেন?

চিত্রকর : বিয়ে করার জন্যই।

লায়লি : হেয়ালি রাখ। তুমি শিল্পী, তুমি কেন আমাকে তোমার দুঃখের সাথী করে তোমার স্বচ্ছন্দ জীবনকে এমন বোঝা করে তুললে? আমি জানি আর তুমিও জান, তুমিও শান্তি পাচ্ছ না, আমিও সোয়াস্তি পাচ্ছিনে, আমাদের এই টানাটানির জীবন নিয়ে।

চিত্রকর : তুমি সেরে ওঠ, তারপর সব কথা বলব। আজ নয়।

লায়লি : না, তুমি আজই বল। মরতেই যদি হয়, তবে ও-জিনিসটা যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। জীবনে অনেক টানাহেঁচড়া করেছি, মরণে আর ওটা সইবে না।

চিত্রকর : সব কথা কি সব সময় মানুষ বলতে পারে, লায়লি?... আমি কি শুধু শিল্পীই? আমি কি শিরাজ নই? বিয়ে তোমায় করেছে মানুষ-শিরাজ, শিল্পী-শিরাজ নয়। ... তোমাতে আমাতে দ্বন্দ্ব কোনখানে, জান? তুমি চাও শুধু মানুষ-শিরাজকে, শিল্পী-শিরাজকে তুমি দুচোখে দেখতে পার না। অথচ আমি মানুষ-শিরাজ যতটুকু, তার অনেকগুণ বেশি শিল্পী-শিরাজ।

লায়লি : (অনেকক্ষণ ভেবে) ধরে নিলুম, তোমার কথাই সত্যি। তা হলেও, আমার মাঝে কি শুধু রক্ত-মাংসের মানুষেরই ক্ষুধা পরিতৃপ্তির সমাপ্তি আছে, আনন্দ-বিলাসীর শিল্পীর ধেয়ানলোকের কোনো কিছুই নেই?

চিত্রকর : আছে। তোমাকে আমার ধেয়ানলোকে পাই, যখন তুমি থাক আমার ধরা-ছোঁওয়ার আড়ালে। তখন তুমি শুধু আমার অঙ্ক-লক্ষ্মী নও, শিল্পী-শিরাজের হৃদয়-লক্ষ্মী, ধ্যায়ানের ধন। ... যে ফুলের মালা সন্ধ্যায় লাগে ভালো, নিশি-শেষে তা যদি বাসি ঠেকে, লায়লি তার জন্য অপরাধী তুমিও নও, আমিও নই। চির-সুন্দরের তরে নিত্য নব-তৃষা মানুষের চিরকেলে অপরাধ। এই তৃষা যার যত প্রবল, সে সুন্দরের তত বড় ধেয়ানী। মানুষের শৃঙ্খলিত সমাজে হয়ত সে-ই আবার তত বড় অপরাধী। ... মস্ত ভুল করেছি লায়লি, স্বর্গের সুন্দরকে ধুলায় আবিলতায় নামিয়ে।

লায়লি : আমিও বুঝতে পারিনে, অপরাধ কার কতটুকু। তোমার কলঙ্কে যখন দেশ ছেয়ে গেছে, তখনো আমি তোমায় ভালোবেসেছি সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সবাই যখন বড় করে দেখতো তোমার কলঙ্ক, আমি তখন দেখেছি তোমার জ্যোৎস্না। আমি কতদিন অহঙ্কার করে বলেছি, 'কলঙ্কী চাঁদকে দেখে সাগরের বুকেই জোয়ার জাগে, খানা-ডোবা চাঁদকে চেনেও না, তাদের বুকে জোয়ারও জাগে না। ... কিন্তু আজ কেন মনে হচ্ছে, আমিও তোমায় ভালোবাসিনি, তোমার যশ, তোমার খ্যাতিকে ভালোবেসেছি। নৈলে সাগরে জোয়ার তো শুধু পূর্ণিমার চাঁদকে দেখেই জাগে না, অমানিশির নিরুজ্জ্বল চাঁদকে দেখেও সে সমান উতলা হয়।

চিত্রকর : দূরে থেকে তুমি ভালোবেসেছিলে—শিল্পী, কাছে এসে পেতে চাও শিরাজকে—মানুষকে।... এটাই তোমাদের নারীর ধর্ম। তোমরা আকাশের

জ্যোতিষ্ক হতে চাও না—হতে চাও মাটির ফুল। তোমরা শুধু দূরের সুন্দরের ধ্যানেই তৃপ্ত হতে পার না, নিকটের নির্মমকেও পেতে চাও। যে বিরহে তোমরা বেদনা-ক্ষুণ্ন বিষাদিনী, সেই বিরহে পুরুষ হয়ে ওঠে ধেয়ানী, তপস্বী। তোমরা কাঁদ, পুরুষ ধ্যান করে। তোমরা যেখানে কর অভিসম্পাত, পুরুষ সেখানে করে স্তব।

লায়লি : কি জানি, তোমাদের সব কথা সব সময় বোঝা যায় না। আজও বুঝি না।... আমার দুঃখ এইটুকু যে, আমার বলতে তোমার কাছে কিছু পেলুম না। শিল্পী-শিরাজ তো সকলের। সেখানে আর একার দাবি অস্বাভাবিক আবদার, তা বুঝি। কিন্তু যদি দেখি, শিরাজ শুধু শিল্পীই, সে মানুষ-শিরাজ নয়, সেখানে আমার সান্ত্বনা কোথায়? দূরের মানুষ অল্প নিয়েই খুশি থাকতে পারে, আমার পোড়াকপাল—আমি যে তোমার নাকি সহধর্মিণী, নৈলে কিসের দুঃখ আমার?

চিত্রকর : উপায় নাই লায়লি, উপায় নাই! যাদের আমি একদিন আমার সকল হৃদয়-মন দিয়ে চেয়েছি, আজ তারা সবাই আমার কাছে পুরাতন হয়ে উঠেছে। শিল্পী-আমারই জয় হল। মানুষ আমি বহুদিন হল মরে গেছি। মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না কেন যেন আর আমায় বিচলিত করতে পারে না। শুধু মনে হয় প্রাণ ভরে সুন্দরকে দেখে যাই, রেখায় রেখায় রঙে রঙে তাকে অমর করে যাই। আমরা শিল্পীরাই তো চির-নূতন করে রেখেছি, চির-যৌবন দিয়েছি সুন্দরকে, আমাদের মনের নবীনতা দিয়ে, যৌবন দিয়ে।... যখন মনে করি, তুমি আমার কেউ নও, মনে হয় কোনো লোকের যেন অপরিচিতা, তখন তুমি সুন্দর। যখন তোমায় পাই বাহুর বন্ধনে বুকের পাশে, তখন তুমি নারী—প্রজাপতির পাখার রঙ-এর মতো ছুঁলেই রঙ যায় মুছে।

লায়লি : আমি যদি মরে যাই, তোমার দুঃখ হবে না? তুমি কাঁদবে না?

চিত্রকর : না। শয্যাপার্শ্বে বাহুর বন্ধনে যাকে ধরতে পারিনি, তাকে ধরব ধেয়ানের গোপন-লোকে। আমার তুলির রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমায় দান করব চির-বৈচিত্র্য, চির-নবীনতা, চির-যৌবন। মরলোকের বধূ আমার হবে অমর লোকের অপ্সরী। আমার গৃহ-লক্ষ্মী হবে নিখিল-শিল্পীর বিশ্বলক্ষ্মী!

লায়লি : ওগো দোহাই তোমার! আমি চাইনে অত গৌরব, অত মহিমা! তুমি আমায় বাঁচিয়ে তোল! আমি বাঁচতে চাই। তোমায় পেতে চাই! মরতেই যদি হয়, এত দারুণ তৃষ্ণা নিয়ে মরতে চাইনে। আমি মরতে চাই স্বামীর কোলে, পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজনের মাঝে। যেতে চাই বাড়ি-ভরা ক্রন্দনের তৃপ্তি নিয়ে, এমন করে এই মাঠের মাঝে শূন্য ঘরে এক পাষাণের পায়ের তলে পড়ে মরবার আমার সাধ নেই!

চিত্রকর : (অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে) উপায় নেই লায়লি, উপায় নেই! সত্যিই আমি নিরূপায়। (বাহিরে দরজায় কাহার করাঘাত শোনা গেল) কে?

বাহিরের শব্দ : আমি। তোমার বন্ধু!

লাইলি : (চিৎকার করে) খুলো, না! দোর খুলো না! আমি চিনেছি, ও কে। ও ডাইনী, ও চিত্রা।

চিত্রকর : ছিঃ লায়লি! তুমি শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, এ কি ব্যবহার তোমার?

চিত্রা (বাহির হতে)। আমি ভিতরে যাব না বন্ধু, তুমি বেরিয়ে এসো।

লায়লি : যাও! তোমার বাইরের ডাক এসেছে। তোমার সুন্দরের ধ্যান আমি ভাঙব না। আমায় ক্ষমা কর। আমি যেদিন থাকব না, ঐ চিত্রার মাঝেই আমাকে স্মরণ করো।

(চিত্রকর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। ঘরের প্রদীপও সাথে সাথে নিভে গেল)।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ লায়লির পিত্রালয়। নদীতীরে সুরম্য অট্টালিকার নির্জন প্রকোষ্ঠে লায়লি ও চিত্রকর। সপ্তমী চাঁদের পানসে জ্যোৎস্না বাতায়ন-পথে এসে শিল্পীর চোখে-মুখে পড়ে তাকে বন্দি দেবকুমারের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। শিল্পী নদীর ঢেউএ চাঁদের খেলা দেখছিল ]

লায়লি : 'লায়লি' মানে জান?

চিত্রকর : (উদাস স্বরে) জানি—নিশিথিনী।

লায়লি : সত্যিই আমি নিশিথিনী—অমা-নিশীথিনী। চাঁদ নাই, তারা নাই,—অন্ধকার আর আকাশ!

চিত্রকর : (হেসে) আর একজন লায়লি ছিল, তার প্রেমিকের নাম ছিল মজনু, অর্থাৎ উন্মাদ।

লায়লি : জানি।

চিত্রকর : কিন্তু সে লায়লি এ লায়লির মতো সুন্দর ছিল না।

লায়লি : (তীব্র স্বরে) দোহাই! আর বিদ্রুপ করো না। ও-প্রশংসা চিত্রাকে করো, সে খুশি হবে।

চিত্রকর : হয়তো হবে। তবু মনে হয়, তুমি সুন্দর, চিত্রা অপূর্ব।

লায়লি : তার মানে?

চিত্রকর : তুমি ধরার চাঁদ, চিত্রা আকাশের চাঁদ। ঐ নদীর ঢেউ-এ চাঁদের লীলা দেখছ? ওকে বোঝা যায় না, ও কেবলি রহস্য।

লায়লি : এই কথা বলবার জন্যই কি এখানে এসেছ? যদি তাই এসে থাক, তবে দয়া করে তুমি ফিরে যাও। তোমার চিত্র আর চিত্রার মাঝে গিয়ে আমি দাঁড়াতে চাইনে। আমি বহু কষ্টে বেঁচে উঠেছি।

চিত্রকর : কি জন্য এসেছিলাম লায়লি, তা আর মনে নেই। এখন মনে হচ্ছে ঐ চাঁদ ঐ নদী আর ঐ নদীর জলে চাঁদের খেলা দেখতেই এসেছি যেন। (অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবলে) কদিন থেকে এও মনে হচ্ছিল, তুমি আমায় ডাকছ। সত্যি কি তুমি ডেকেছিলে আমায়?

লায়লি : মা তাই বলেন। যখন রোগ খুব বেড়েছিল তখন নাকি তোমায় ডাকতাম অজ্ঞান অবস্থাতেও।

চিত্রকর : কি জানি লায়লি, কিছু বুঝিনে। অদ্ভুত এই মানুষের মন। কাছে থাকলে যাকে মনে হয় বোঝা, দূরে থেকে সে-ই কী করে এমন আকর্ষণ করে, বুঝতে পারিনে। আমার মাঝে এই যে মানুষের আর শিল্পীর দ্বন্দ্বে

বেঁধেছে এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই এসেছি এখানে—একেবারে 'মরিয়া হইয়া'।

লায়লি : কী জানি, আমার ভয় করছে কেন তোমাকে দেখে অবধি। মনে হচ্ছে কী একটা সঙ্কল্প করছ তুমি মনে মনে। তুমি কি কোথাও চলে যেতে চাও?

চিত্রকর : তাই। আমি চলে যাব বলেই এসেছি। মানুষ কেবলি পিছু টানছে—শিল্পী কেবলি ইঙ্গিত করছে দূরের পানে—যে পথে বাঁশির সুর যায় উধাও হয়ে, ফুলের সুবাস যায় হাওয়ায় মিশে। মনে হয় ঐ কোকিল, পাপিয়া 'বৌ কথা কও'—সকলে আমার বন্ধু ওরা আসে, গান করে, আবার চলে যায়।

লায়লি : তারাও আবার আসে, আবার গান করে।... দেখ, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তোমাকে জোর করে ধরে রেখে আমারও শান্তি নেই, তোমারও শান্তি নেই। তুমি যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াও, শুধু মাঝে মাঝে আমায় দেখা দিয়ে যেও। (বলতে বলতে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল)

চিত্রকর : আসব, আপনা থেকেই আসব। আর যদি না আসি, ভুলে যেয়ো।

লায়লি : (শান্তস্বরে) তাই ভুলে যাব। আজই এখনই যাও, তাহলে, ঐ চাঁদ ডোবার আগেই।

চিত্রকর : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল) লায়লি!

লায়লি : দাঁড়াও! যাবার আগে একটা জিনিস উপহার দেবো, নেবে?

চিত্রকর : দাও। (লায়লি অন্য ঘর হতে একটি চিত্র এনে চিত্রকরকে দিয়েই চলে যাচ্ছিল) একি! এ চিত্র কে আঁকলে?

লায়লি : (চলে যেতে যেতে) আমি!

চিত্রকর : অ্যাঁ! তুমি?

লায়লি : হাঁ, ঐ আমার দীর্ঘ বিরহের তপস্যার স্মৃতি।

চিত্রকর : এই দীর্ঘ দিন মাস শুধু আমারই ছবি এঁকেছ? যে তার জীবনকে ব্যর্থ...

লায়লি : (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) ব্যর্থ করনি শিল্পী। কিন্তু সে কথা তুমি বুঝবে না (চলে গেল)।

চিত্রকর : (চিত্রখানা ললাটে স্পর্শ করিয়ে) তুমি সুখি হবে, তুমি সুন্দরের সান্নিধ্য লাভ করেছ (ধীরে ধীরে নেমে দূর জ্যোৎস্না-ধৌত পথে মিলিয়ে গেল। লায়লি বাতায়ন-পথে তাই দেখতে দেখতে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেল)।

## তৃতীয় দৃশ্য

[ শৈল-নিবাস। সন্ধ্যা ]

চিত্রা : আচ্ছা শিরাজ, একটা কথা বলব, তুমি সত্য করে উত্তর দেবে?

চিত্রকর : 'শিরাজ' নয় চিত্রা, শিল্পী বল, বল, বন্ধু বল—যা বরাবর বলেছ।

চিত্রা : আর কিছু না? তুমি শুধু শিল্পীই? শুধু আনন্দলোকের নিঃসঙ্গ স্বপ্নচারি তুমি? এই মাটির মদির গন্ধ তোমায় মাতাল করে তোলে না?

চিত্রকর : তোলে চিত্রা। সে শুধু নিমেষের জন্য। তারপর উড়ে চলি ঊর্ধ্বে, নিম্নে চারপাশে শুধু আকাশ, শুধু সুনীলের শান্ত উদার শূন্যতা, সেইখানে উঠে গাই আনন্দের গান। সেইখানে বসে রচনা করি আমার চিত্রলেখা।

চিত্রা : আচ্ছা, আমায় চিত্রা বল কেন? আমি তো চিত্রা নই।

চিত্রকর : জানি। কিন্তু তুমি যে আমার সুন্দরের প্রতীক। আমার শিল্পী-লক্ষ্মী, ধেয়ান-প্রতিমা তুমি।

চিত্রা : তুমি এমন করে বল বলেই তো তোমায় কাছে—আরো কাছে পেতে ইচ্ছা করে—যেমন করে আমার নোটন-পায়রাগুলিকে বুকে জড়িয়ে চুমু খাই তেমনি করে। আমিও তো তোমায় শাপ-ভ্রষ্ট দেবকুমার শিল্পী বলেই জানতাম। তাই তোমার কাছে এসেছিলাম শ্রদ্ধার পূজাঞ্জলি নিয়ে। ... তুমি মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখলে। আমার রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে, তবু ঐ চাওয়া দেখে মনে হল, আমার এত রূপ সার্থক হল এতদিনে। মনে হল, এত রূপ ধরবার মতো শুধু এই দুটি চোখই আছে পৃথিবীতে। তোমার স্তব-গানে আমার হৃদয় শতদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠল! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে) হায় উদাসীন! তুমি আমায় বুঝবে না। তুমি বিকশিত শতদলের শোভা দেখ শুধু, বেদনায় শতদল বিকশিত হয়ে ওঠে সে বেদনার কী বুঝবে তুমি?

চিত্রকর : সত্যি চিত্রা, শিল্পী চাঁদ পাখি—এরা আর সব বোঝে, শুধু বোঝে না বেদনা।

চিত্রা : তুমি পাষাণ এ্যাপোলো। তবু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, সত্যি তোমার মনে আর কোনো লোভ নেই? যে ফুল কাননে ফোটে, তাকে কাননেই ঝরতে দিতে চাও, মালা করে গলায় পরাতে ইচ্ছা করে না?

চিত্রকর : না বন্ধু, ফুলের সুবাসই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাঁকে গলায় জড়িয়ে ফাঁসি পরবার সাধ আমার নেই।

চিত্রা : আমি অন্যের হলে তোমার দুঃখ হবে না।

চিত্রকর : হবে। সে দুঃখ আমার জন্য নয়, তোমার জন্য। সুন্দর ফুল এমনি ঝরে পড়ে তা সওয়া যায়, কিন্তু তাকে জোর করে বৃন্তচ্যুত করে কাঁটা বিঁধে মালা করতে দেখলে আমার কষ্ট হয়।

চিত্রা : (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ম্লান স্বরে) ও-ব্যথা তো সকলের জন্য। একা-আমার জন্য তোমার কোনো ব্যথাই নেই?

চিত্রকর : (আকুল স্বরে) না চিত্রা। আমি শিল্পী, হৃদয়হীন নির্বেদ উদাসীন শিল্পী!

চিত্রা : (সজল কণ্ঠে) তা হলে আমি যাই?

চিত্রকর : (শান্ত স্বরে) যাও।

চিত্রা : তোমার একটা কিছু দেবে আমায়—তোমায় মনে রাখবার মতো কিছু?

চিত্রকর : (তার তুলি নিয়ে) এই নাও।

চিত্রা : এ কি? তুলি? তুমি আর ছবি আঁকবে না?

চিত্রকর : (সাশ্রুনেত্রে) না চিত্রা! আমার এই তুলি বহু হৃদয়ের রক্তে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, আর পারি না!

চিত্রা : (সবিস্ময়ে) এ কি শিল্পী?

চিত্রকর : এই সত্যি চিত্রা! জীবনে এই প্রথম অশ্রু এল আমার চোখে। যেই তুমি চলে যেতে চাইলে, অমনি কেন আমার এই প্রথম মনে হল, এমন সুন্দর বিশ্ব কে যেন তার স্থূল হস্ত দিয়ে মুছে ফেলছে!—আমি চললাম চিত্রা।

চিত্রা : (হাত ধরে) কোথায় যাবে বন্ধু?

চিত্রকার : (ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেই হাতে চুম্বন করে) যে-পথে পৃথিবীর কোটি কোটি ধূলিলিপ্ত সন্তান নিত্যকাল ধরে চলেছে, সেই দুঃখের, সেই চির-বেদনার পথে। (প্রস্থান)

## যবনিকা

# ভূতের ভয়

## প্রথম দৃশ্য

[ স্থান—দেবলোক। দেবাধিপতি, দেবকুমারগণ ও দেব-কন্যাগণের আহূত সভা-মণ্ডপ ]

( দেবকুমার ও দেবকন্যাগণের গান)

জাগো জাগো দেব-লোক।
এল স্বর্গে কি মৃত্যুর ভয় দুখ-শোক॥

সাত সাগরের গড়খাই পার হয়ে ঐ
এসে পিশাচ প্রেতের দল নাচে থৈ থৈ
জাগো সুর-ধীর দেব-বালা মাভৈ মাভৈ
নব মন্ত্র-পূত নব-জাগরণ হোক॥

ওরা আনিয়াছে পাতালের ভীতি মারীভয়,
মোরা ভয়ে শুধু পরাজিত, শক্তিতে নয়।
ওঠ ওঠ বীর উন্নত-শির দুর্জয়,
ভেদি কুয়াশা মায়ার,
আনো আশার আলোক॥

দেবাধিপতি : মাভৈ ! মাভৈ ! বন্ধুগণ, আমরা এতদিনে আমাদের মন্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। সে মারণ-মন্ত্র নয়—মরণ-মন্ত্র। আমরা—দেবলোকবাসী এতদিন নিজেদের অমর মনে করে জীবনকে অবহেলা করেছি। অমৃতকে পচিয়ে মদ করে তারি নেশায় যখন বুঁদ হয়ে গেছি, তখনি এসেছে সাগর-পারের নির্বাসিত অভিশপ্ত প্রেত-পিশাচের দল। তারা আমাদের প্রমত্ততার-জড়তার অবকাশে আমাদের অমৃত, কবচ, শক্তি সব কিছু অপহরণ করেছে। আজ বিশ্ববাঞ্ছিত দেবলোক নিরামৃত নির্জীব, নিষ্প্রাণ, শক্তিহীন। আমাদেরই পাপে আজ তারা মৃত্যুঞ্জয়ের বর লাভ করে দেব-লোক জয় করেছে। আমরা আজ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসাদ হতে বঞ্চিত

সত্য,—আজ আমাদের তপস্যার শক্তি অপহরণ করে প্রেতের দল শক্তিমান সত্য,—তবু আজ একমাত্র আশা—আমরা আমাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। আমাদের হস্তপদের অশেষ বন্ধনের দারুণ পীড়া অনুভব করবার চেতনা ফিরে পেয়েছি।

সমবেত কণ্ঠে : সাধু! সাধু!

দেবাধিপতি : আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা-স্থানীয় দেবকুমার ও দেবকন্যাগণ! তোমাদের এক শতাব্দী পূর্বে আমার জন্ম, আর আমাদেরি পাপে তোমরা আজ প্রেতের মায়ায় বদ্ধ—কারারুদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করছি—দেবলোকে জরা-মৃত্যুর, দুঃখ-তাপের বলি হয়ে। তোমরা নিষ্পাপ, তোমাদের পিতৃ-পিতামহের পাপে তোমরা আজ প্রেতাধীন। আমরা ভূতাধীন—অতীতের দাস, তোমরা বর্তমান শতাব্দীর নবজাত শিশু। তোমরা অতীতের দাসকে—ভূতের অধীনকে মুক্ত করো। পদাঘাতে পাতিত করো ভূতকে—অতীতকে, দক্ষিণ করে কর মিলিয়ে টেনে তোলো ভবিষ্যৎকে!

সমবেত কণ্ঠে : সাধু! সাধু! জয় দেবাধিপতির জয়!! অমর দেবলোকের জয়!!

দেবাধিপতি : দেবলোকের জয়ধ্বনি করো, দেবাধিপতির নয়। আমি অতীতের লজ্জা, ভূতের লাঞ্ছনা আমায় অপবিত্র করেছে!

দেব-সঙ্ঘের একজন : না, না। আপনি তার ব্যতিক্রম। সত্য, আপনি জরায় ন্যুব্জ। কিন্তু ঐ ন্যুব্জ দেহই অতীত হতে বর্তমানে আসার সেতু।

সমবেত জয়ধ্বনি : সাধু! সাধু! বেশ বলেছ ভাই! বেঁচে থাকো!

দেবাধিপতি : তোমাদের এই শ্রদ্ধাই আমার সকল কলঙ্ক, সকল লজ্জাকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। তাই আজ আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়াবার দুঃসাহস অর্জন করেছি। আমি বলছিলাম—আমরা আমাদের ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। যে অস্ত্র ধাতু দিয়ে তৈরি নয়, সে অস্ত্র বাণীর। সে অস্ত্রের নাম 'মাভৈ!'

সকলে : মাভৈ! মাভৈ!

দেবাধিপতি : হাঁ, ঐ মন্ত্র উচ্চারণ কর সকলে—মাভৈ! মাভৈ! ভয় নাই! শুধু এই বাণীর আশ্বাসে—এই মন্ত্রের জোরেই আমরা

অভিশপ্ত-আত্মা ভূতের দলকে আবার সাগর-পারে তাড়িয়ে রেখে আসবো।

সকলে : মাভৈ ! জয় দেব-লোকের জয় !

জনৈক দেবযুবা : শুধু বাণীর আশ্বাসে আমরা বিশ্বাসী নই দেবাধিপতি। আমরা বলি 'এহ বাহ্য !'

সমবেত দেবসঙ্ঘ : বসে পড় ! বসিয়ে দাও !

দেবাধিপতি : (দক্ষিণ কর উত্তোলন করিয়া সকলকে শান্ত হইবার ইঙ্গিত করিলেন। দেব-সঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিল) কে তুমি উদ্ধত যুবক ? তোমাকে এই নিপীড়িত দেবপুরীর কোনো যজ্ঞে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

দেবযুবা : আমরা থাকি আপনাদের যজ্ঞের গোপনতম অন্তরালে, দেবাধিপতি ! আমরা আপনার যজ্ঞের মন্ত্র উপাসক নই—আমরা যজ্ঞের অগ্নিপূজারী ! আমরা যজ্ঞের আহুতি হয়ে আত্মবলি দিই, আর সেই আহুতিই হয়ে ওঠে লেলিহান অগ্নিশিখা। আমরা নিপীড়িত দেব-আত্মার দাহিকা-শক্তি।

দেবাধিপতি : চিনেছি তোমায়। তুমি বিপ্লব-কুমার ! বীর ! আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ কর। তোমাদের প্রাণকে—তোমাদের দুর্দৈব বিলাসিতাকে আমি শতবার প্রণাম করেছি—কিন্তু তোমাদের এই পথকে মুক্তির শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলে গ্রহণ করতে পারিনি। আমি ভূতগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, —জানি। তবু বলি—সৈনিকের দুর্ধর্ষতাই একমাত্র গুণ নয়। দুর্ধর্ষতা সৈনিককে করে শুধু সৈনিক, ধৈর্যই করে তাকে মহান।

বিপ্লব-কুমার : আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন দেবাধিপতি ! আপনাকে আমরা পূজা করি দেবতার অন্তরের রাজাধিরাজ বলে, কিন্তু আপনাকে কিছুতেই মনে করতে পারিনে—আপনি আমাদের যুযুৎসু, সেনাদলের অধিনায়ক।

দেব-সঙ্ঘ : বসিয়ে দাও ! বসিয়ে দাও ! উন্মাদ ! উন্মাদ !

বিপ্লব-কুমার : হাঁ বন্ধু, আমরা সত্যসত্যই উন্মাদ। আমাদের উন্মাদনার গান শুনবে ?

দেব-সঙ্ঘের কয়েকজন : এই রে ! সর্বনাশ করলে এই পাগলাচণ্ডী ! এইবার ধরল বুঝি ভূতে

[ বিপ্লবকুমারের গান ]

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো
মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি
আর প্রাণে না সয়॥
তোদের পিঠ হয়েছে বারোয়ারি ঢাক
যে চায় হানে মার,
সেই ঢাক গড়িয়ে মারের পিঠে
পড়ুক না এবার !
তোরা নবীন মন্ত্র শোন্ আমাদের—
'প্রহার ধনঞ্জয় ! !'

দেবসঙ্ঘ : সাধু ! সাধু ! 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' ! জোর বলেছ দাদা ! বেঁচে থাক !

আছে তোদের গায়ে ভূতের লেখা
হাজার মারের ঋণ,
এবার ফিরিয়ে দিতে হবে সে মার
এসেছে আজ দিন !
ওরে মন্ত্র দিয়ে হয় কি কভু
বনের পশু জয়॥

ওরে দৈন্যরে তোর সৈন্য করে
রণের করিস ভাণ,
খর স্রোতের মুখে খড় ভেসে কয়—
'সাগর-অভিযান !'
তোরা যজ্ঞ করিস অযোগ্য সব
প্রাণে মৃত্যুভয় !

তোদের হাড্ডি গেছে মাংস গেছে
চামড়া মাত্র সার,
তোরা তাই নিয়ে কি ভাবিস তোরা
যজ্ঞ অবতার।
তোদের শুষ্ক দেহে জ্বালা এবার
আগুন জ্বালাময়॥

দেব-যুবাগণ—জয় বিপ্লব-কুমারের জয়! সকলের গান—

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো
মন্ত্র দিয়ে নয়!

দেবাধিপতি : আমি কি তা হলে বুঝব ... এই তোমাদের ঈপ্সিত পথ? বন্ধুগণ! তা হলে আমায় বিদায় দাও। আমি জানি—ও-পথ মৃত্যুর পথ, জীবন জয়ের পথ নয়। মৃত্যু তো আমরা ভূতের হাত দিয়েই নিত্য-নিয়ত পাচ্ছি ওর জন্য নতুন আয়োজনের তো কোনো দরকার নেই। আমরা চাই জীবন। বরং জীবন লাভ করতে হলে চাই,—তপস্যা! যুদ্ধ নয়! তা ছাড়া, যুদ্ধ করবে কার সাথে? এ মায়াবী ভূতের দল তো সামনে থেকে দিনের আলোকে যুদ্ধ করে না। এরা যুদ্ধ করে অন্ধকারের আড়ালে থেকে—অন্তরীক্ষে থেকে—পাতালতলে থেকে। শূন্যের সাথে যুদ্ধ করি কি দিয়ে? এরা শাসন করছে ভয় দিয়ে—অস্ত্র দিয়ে তো নয়। অস্ত্রধারীর বিপক্ষে অস্ত্র ধরা যায়—কিন্তু ভয় দেখানো ভূতের উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে হলে মাভৈ-বাণীর ভরসা ছাড়া অন্য উপায় নেই!

[এমন সময় সভা-মণ্ডপে ভীষণ আর্তরব উঠিল। সভার সকলে যে যেদিকে পারিল—ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

চতুর্দিকে 'ভূত—ভূত' রব উঠিতে লাগিল। ভূতেদের কাহাকেও দেখা গেল না। কেবল অন্তরীক্ষে কিসের ভীষণ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সভার সমস্ত আলোক একসঙ্গে নিভিয়া গেল। মনে হইল, অসংখ্য কায়াহীন ছায়া বীভৎস মূর্তিতে সভা-মণ্ডপ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিপ্লব-কুমার ও দেবাধিপতি ব্যতীত সভামণ্ডপে আর কাহাকেও দেখা গেল না ]

বিপ্লব-কুমার : দেবাধিপতি! এই কাপুরুষের দল কি আপনার মন্ত্র-শিষ্য।

দেবাধিপতি : (হাসিয়া) এরাই কি তোমার যুদ্ধ-সেনা? জানি বন্ধু, আমাদের দেব-জাতির ক্লীবতা নির্লজ্জতার কত অতলতলে গিয়ে পড়েছে, তাই আমি বলি—এই জাতিকে দিয়ে যুদ্ধজয়ের কল্পনা একেবারে অসম্ভব।

বিপ্লব-কুমার : এই অসম্ভবের সম্ভাবনার আশাতেই আমি ভবিষ্যৎ-কালের প্রতীক—যৌবনের প্রতীক পথে বেরিয়েছি, দেবাধিপতি! আমার জীবনে তারি শেষ ফলাফল দেখতে পাই। কিন্তু—এ কি! আমিও কি ভূতের মায়ায় আবদ্ধ? আমি আর নড়তে পারছিনে কেন?

দেবাধিপতি : বন্ধু! আমরা অনেক আগেই ভূতের মায়ায় বন্দি হয়েছি। আমাদের দুই জনেরই এখন এক গতি। আমাদের জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ

আজ এক সাথে বন্দি হয়ে পাতাল-পুরীর অন্ধকার আশ্রয় করে পড়ে থাকবে।

বিপ্লব-কুমার : আপনার মন্ত্র হয়তো বাধাকে বাধা না দিয়ে জয় করা। কিন্তু আমি সে মন্ত্রের উপাসক নই, দেবাধিপতি। আমি এ বন্ধন ছিন্ন করবো।

(বংশীবাদন ও সঙ্গে সঙ্গে সহস্র রক্ত-বেশ-পরিহিত দেব-যুবার প্রবেশ। তাহারা আসিয়াই ঝড়ের বেগে বিপ্লব-কুমারকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। চতুর্দিকে ভূতের অবোধ্য ভাষায় ভীষণ কিচির-মিচির শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ রক্ত-আলোকে দেখা গেল—বাঁদর, ভল্লুক, শৃগাল, কুকুর, শার্দুল, হায়েনা, খটাস প্রভৃতি নানা মুখের নানা বীভৎস ভূতের দল দেবাধিপতিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেবাধিপতি প্রসন্ন হাসিমুখে তাহাদের অনুগমন করিতেছেন। সহসা নানাপ্রকার রথে আরো নানা মুখের ভূতের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই তাহারা দিকে দিকে রথ লইয়া বিপ্লব-কুমারের দলকে ধরিতে বাহির হইয়া গেল। ভূতের মুখে নাকি-সুরে শুধু এক শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল—বিপ্লব-কুমার! বিপ্লব-কুমার।)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ দেব-লোক। ভূত-নিবারিণী সভার সভ্যগণ তাঁহাদের নব-নির্বাচিত সভাপতি জয়ন্তের প্রাসাদে কথোপকথন করিতেছেন। ]

জয়ন্ত : আমি বলি কি, আমাদের বন্দি নেতা দেবাধিপতির নির্বাচিত পথই আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রকৃষ্ট পথ। অবশ্য অধিকাংশ সভ্যের মতো হলে আমরা এর চেয়েও এক ধাপ উপরে উঠবার চেষ্টা করতে পারি।

জনৈক সভ্য : আমরা দেব-লোকে এতদিন শুধু 'মাভৈ'-বাণীর মন্ত্রই প্রচার করেছি। তাতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। ভূতের ভার দেবলোক হতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না হলেও তাদের বিরুদ্ধে যে বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে—তাতেই আমাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হবে। এই অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে শোষণ-শুষ্ক দেবলোক !

দ্বিতীয় সভ্য : আমিও বলি, আমরা তো হাতে মারতে পারবো না ওদেরে। এখন ভাতে মারতে পারি কি-না তারই আয়োজন করতে হবে।

তৃতীয় সভ্য : কিন্তু এ ভূত যে আমাদের অন্নের চেয়ে রক্তই শোষণ করে বেশি। ঐ রক্ত-খেগো ভূতকে ভাতে মেরে বিশেষ সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।

দ্বিতীয় সভ্য : ভাতে মারা মানেই ওদের প্রাণ—আমাদের রক্ত শোষণে বাধা দেওয়া। তাহলেই ওদের আয়ু যাবে কমে। আমিও বলি যুদ্ধ করে ওদের কাটব কি, ওরা যে কন্দকাটা ভূত। ওদের রক্তপাত করলেই ওরা হয়ে উঠবে আরো ভীষণ, ছিন্নমস্তার মতো নিজের রক্ত নিজে পান করে উন্মাদনৃত্য শুরু করে দেবে।

জয়ন্ত : ও-কথার আলোচনায় এখন প্রয়োজন নেই। রক্তারক্তির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। আমাদের এ অহিংস যুদ্ধ। আমরা দলে দলে ধরা দিয়ে ওদের পাতালপুরীর সমস্ত রন্ধ্র বন্ধ করে দেবো। যে অন্ধ-কারার ভয় দেখিয়ে ওরা আমাদের নির্বীর্য করে রেখেছে, সেই ভয়টাকেই আগে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে। মারবে কতক্ষণ ?

ওদের মারের মুখে যদি আমাদের দেবলোকের সব শির এগিয়ে দিই, তাহলে দুদিনেই ওদের মারের অস্ত্র যাবে ভোঁতা হয়ে—মারের শক্তি যাবে ফুরিয়ে।

চতুর্থ সভ্য : আমাদের দলপতি ঠিক বলেছেন। কিন্তু এই প্রতিরোধই যথেষ্ট নয়। ওরা আমাদের অমৃত অপহরণ করে তার বদলে যে বিষমাখা খাদ্য জোর করে খাওয়াচ্ছে—আমরা শুকিয়ে মরলেও তা আর গ্রহণ করব না। আমাদের লজ্জা নিবারণ করতে হয় ভূতুড়ে কিম্ভুতকিমাকার বস্ত্র দিয়ে, আমরা আর তা পরবো না। নির্যাতন আরো বেশি চলুক, তবু ওদের দান গ্রহণ করে আমাদের পবিত্র দেবকান্তিকে আর অপবিত্র পঙ্কিল করে তুলবো না।

(হঠাৎ সম্মুখ দিয়ে বিপ্লব-কুমার চলিয়া গেল)

জয়ন্ত : ওকে চেনেন আপনারা? ওই বিপ্লব-কুমার। কখনো গান গায় কখনো যুদ্ধ করে। কখন যে কি করে বুঝবার উপায় নেই। ভূতের চোখে ধূলো দিয়ে রাত-দিন ও এই দেবলোকে নানা মূর্তিতে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে বেড়াচ্ছে। ভূতেদের চেষ্টার আর অন্ত নেই ওকে বন্দি করার, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারে না। ও কি বলে, কী করে কিছুই বোঝা যায় না।

পঞ্চম সভ্য : ওই দেবলোকের একমাত্র যুবা—যে ভূতকেও ভয় দেখাতে সমর্থ হয়েছে। (উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলেন)

(জলন্ত অগ্নি-বর্ণা। স্বাহা দেবীর প্রবেশ। সকলে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া দেবীকে অভ্যর্থনা করিলেন)

জয়ন্ত : আসুন দেবী। আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি।

স্বাহা : আমি কিন্তু আপনার কথা ভেবে এখানে আসিনি, জয়ন্তদেব! আমি ভাবছিলাম ঐ যুবকের কথা—যে এখনি গান গেয়ে চলে গেল।

জয়ন্ত : (ম্লানমুখে) বিপ্লব-কুমারের কথা? কিন্তু ওর আদর্শ তো আমাদের আদর্শ নয়, দেবী!

স্বাহা : এতদিন তাই ভেবেছি। কিন্তু এখন ভেবে দেখলাম, আগুনকে ধোঁওয়া করে রাখায় কোনো লাভ নেই, ওতে চক্ষুই জ্বালা করে—দমই বন্ধ হয়ে আসে—দাহ করে না। আগুন যদি আমরা জ্বালিয়েই থাকি, তাহলে ওকে তুষ-চাপা দিয়ে ধোঁওয়া করে রেখে লাভ নেই, আগুন এবার ভালো করেই জ্বলে উঠুক।

জনৈক সভ্য : মার্জনা করবেন দেবী। আপনি আমাদের দেবী-শক্তি। সমগ্র দেবী-জাতির প্রাণ-শিখা। তবু জিজ্ঞেস করি, তাহলে এ-আগুনে কি আপনিই কুলোর বাতাস করবেন?

স্বাহা : বিপ্লব-কুমারকে দেখে অবধি আমার মনে হচ্ছে আমাদের তাই করাই উচিত। পুরুষেরা যখন ভয়ে পিছিয়ে গেল, তখন নারীকেই এগিয়ে যেতে হবে বই কি! এমন পড়ে পড়ে আর কতদিন মার খাওয়া যায়? এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক!

তৃতীয় সভ্য : (হাসিয়া) আপনাদের রান্নাঘরে থেকে থেকে আগুনটা গা সওয়া হয়ে গেছে দেবী, তাই আপনারা হয়তো ওটাকে ভয় করেছেন না, কিন্তু উনুনের আগুন আর বিপ্লবের আগুণ এক জিনিস নয়!

স্বাহা : উনুনের আগুন আমরা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করি, কিন্তু আপনাদের মুখে আগুন উঠেও—এত ধূমপান করেও তো আগুনের ভয়কে ছাড়িয়ে উঠতে পারলেন না! উনুনের আগুনেও তো আমাদের অনেকে পুড়েছে, এবার নাহয় ওর চেয়ে প্রখর আগুনেই পুড়বে। আমাদের তো পুড়ে মরতেই জন্ম!

জয়ন্ত : আমাদের কোনো সভ্যের প্রগলভতার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি, দেবী। আপনি আমাদের পরিত্যাগ করলে আমরা সত্যসত্যই শক্তিহীন হয়ে পড়বো। আপনি দেবলোকের প্রাণ-স্বরূপা। আমাদের আছে শুধু অস্থি আর চর্ম, আপনাদের আছে প্রাণ। এই প্রাণশক্তি যেখানে যোগ দেবে সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী।

স্বাহা : আমরা যদি সত্যই দেবলোকের প্রাণশক্তি হই, এবং যেখানে যোগদান করি, সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে আপনার দুঃখের তো কোনো কারণ দেখছিনে। দেবলোক ভূত-মুক্ত হোক এই তো আপনারা সকলে চান। সে মুক্তি আপনিই আসুক—আর বিপ্লব-কুমারই আনুক—তাতে তো কিছু আসে যায় না।

জয়ন্ত : কিন্তু বিপ্লব-কুমারের আন্দোলন সে শক্তি আনতে পারবে না বলেই আপনাদের শক্তি সেখানে ব্যয় করে ব্যর্থতা আনতে নিষেধ করছি, দেবী। আমরা বলি, আমরা জয় করবো সত্যের জোরে, আমরা সত্যাগ্রহী। বিপ্লব-কুমার বলে, সে জয় করবে অস্ত্রের জোরে—সে বলে, সে অস্ত্রাগ্রহী। কিন্তু ভূতের অস্ত্রবলের কাছে ওর মূল্য কতটুকু!

স্বাহা : ও শুধু তাই বলে না। বলে, ভূত আর পশু, দুইটা জাতই আগুনকে অতিরিক্ত ভয় করে। এ ভূতের অর্ধেকটা পশু, অর্ধেকটা ভূত। একবার ভালো করে আগুন জ্বেলে তুলতে পারলে এরা তল্পিতল্পা তুলে লম্বা দেবে!

জয়ন্ত : আগুন তো আমরাও জ্বালাতে চাই, দেবী। সে আগুন অসন্তোষের আগুন।

স্বাহা : আগুন নয় জয়ন্তদেব, ও হচ্ছে ধোঁওয়া। বড় বড় ওঝাদেরে দেখেছি, তারা ভূত তাড়াবার জন্য শুধু ধোঁওয়া আর সর্ষে-পড়াই ব্যবহার করে না, —উত্তম-মধ্যম মারও দেয়। নমস্কার! (প্রস্থান)

জয়ন্ত : আমি বিপ্লব-কুমারের খুব বেশি বিরোধী নই, কিন্তু আমার মনে হয়—সে প্রস্তুত না হয়েই নেমেছে। এতে সে দেবলোকের ক্ষতিই করবে।

সভ্যগণ : (উঠিয়া পড়িয়া) এসব আগুনের আলোচনার স্থান এ নয়। আমরা আমাদের সত্যচ্যুত হয়ে পড়বো এখানে থাকলে। এ আলোচনা আমাদের এবং আমাদের দেশের ক্ষতি করবে। আমরা আজ উঠলাম। আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ অন্যদিন অন্য স্থানে হবে। (সকলের প্রস্থান)

(বিপ্লব-কুমার ও স্বাহাদেবীর প্রবেশ)

বিপ্লব-কুমার : আমি তখন এসে ফিরে গেছি, জয়ন্ত দেব। ঐ ভীরু লোকগুলোকে ভয় করিনে, কিন্তু যখন ভাবি যে, দেবলোকের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে ওরাই—তখন আর ক্রোধ সম্বরণ করতে পারিনে। তখন এলে একটা বিশ্রী কলহের সূত্রপাত হত ভেবেই চলে গেছি।

জয়ন্ত : কিন্তু এখনই বা এসেছেন কেন? আপনি তো জানেন, আপনাদের এবং আমাদের পথ একেবারে বিপরীতমুখী।

স্বাহা : সেই মুখকে ঘুরিয়ে একমুখী করবার জন্যই আমি এসেছি, জয়ন্ত দেব!

জয়ন্ত : সে অধিকারের মর্যাদাকে আপনিই আগে ক্ষুণ্ন করেছেন দেবী। আপনি ক্ষমা করবেন, যদি আপনার অধিকারের সম্মান রাখতে না পারি। এ পথ এক হবার পথ নয়। আপনি মনে করেছেন, আপনি এসেছেন আমাদের মাঝে সেতু হয়ে। কিন্তু তা নয়, বরং আমাদের মিলনের যে সম্ভাবনা ছিল, আপনি তাতে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছেন এসে!

[ বিপ্লব-কুমার চমকিত হইয়া উঠিল। সে একবার জয়ন্তের দিকে, একবার স্বাহার দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ]

স্বাহা : (ব্যথা-ক্লিষ্ট কণ্ঠে) তুমি ভুল করলে জয়ন্ত। এই ভুলের জন্য সারা দেবলোককে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সারা দেবলোকের কল্যাণ তাহলে পূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করবে কেমন করে? দেবলোকের কল্যাণের জন্য যদি আমি তোমাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াই, তাহলে কি তোমরা এক হবে?

বিপ্লব-কুমার : এসব হেঁয়ালির মানে তো বুঝতে পারছিনে, স্বাহা দেবী! আমি যা ভেবেছি, তাই যদি সত্য হয়—তাহলে আপনাদের দুইজনকেই বলে

রাখি, আমায় দিয়ে আপনাদের কোনো পক্ষেরই কোনো লাভালাভের ভয় বা আশা নেই। আমি স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই জানিনে। জয়ন্তদেবকে সাথে পেলে আমার ব্রত সহজে উদ্‌যাপন হতো। না পাই, ওকে নমস্কার করে চলে যাব। এর মাঝে মান-অভিমানের পালা আসবার তো কথা ছিল না!

জয়ন্ত : আপনি আমার নমস্য বিপ্লব-কুমার! আমার নির্লজ্জতা ক্ষমা করুন। আপনার পার্শ্বে দাঁড়াবার মতো সংযম আর শক্তি যদি থাকতো, আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আমার সে শক্তিই নাই। তাছাড়া, আপনার পথকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে গ্রহণ করবার মতো বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি আজো। আপনার মন্ত্রে অবিশ্বাসী আপনার পথে শুধু বাধারই সৃজন করবে—পথকে এগিয়ে দিতে পারবে না।

বিপ্লব-কুমার : আপনার শক্তির উপর আপনার চেয়ে আমার বেশি বিশ্বাস আছে, জয়ন্ত দেব। কিন্তু সে শক্তিকে যখন আপনি দেশের বড় কল্যাণের জন্য দান করতে কার্পণ্য করছেন, তখন সেখানে আমার বলবার কিছু নেই। আমার শুধু একটি প্রশ্ন মনে রাখবেন—এবং পারেন তো পরে উত্তরও পাঠাবেন। সে প্রশ্নটি এই যে, দেবলোকের যৌবন আজো শুধু অতীতের দাসত্বই করবে, না সে তার নিজের পথ নিজে রচনা করবে? সোজা পথ দুরূহ বিপদ-সঙ্কুল বলেই কি তাকে ছেড়ে এক বছরের লক্ষ্যস্থলে একশ বছরে পৌঁছুতে হবে? চললাম—স্বাহা দেবী, নমস্কার! আপনার এখন জয়ন্ত দেবের সাহায্য করাই উচিত।

স্বাহা : এখন আপনার পিছনে চলা ছাড়া তো আর আমার অন্য পথ নাই, বিপ্লব-কুমার! যিনি আমাকে বুঝতেই পারেননি, তাঁর পথের বোঝা হয়ে থেকে কোনো লাভ নেই!

জয়ন্ত : নমস্কার! (উভয়কে নমস্কার করিলেন)

বিপ্লব-কুমার : তাহলে আমার পশ্চাতেই আসুন। শক্তি কে ফিরিয়ে দিতে নাই।

## তৃতীয় দৃশ্য

[ গভীর পার্বত্য অরণ্য। সেই অরণ্যে রক্ত-বাস-পরিহিত যোদ্ধবেশে বিপ্লবী দেব-যুবাদল ও বিপ্লব-কুমার। পর্বতের সানুদেশে পর্বত ঘিরিয়া ভূতের শত শত কালো তাম্বু। পর্বত-শিখর অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণ শকুনের মতো দলে দলে ভূতের রথ উঠিয়া ফিরিতেছে। ]

বিপ্লব-কুমার : বীর দেব-সেনাদল ! আজ আমাদের শেষ ভাগ্য-পরীক্ষা। ভাগ্য-দেবী সুপ্রসন্ন, এমন দুরাশা করিনে। তবু যাবার আগে ভূতের নখর দন্তগুলো নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে চাই—আমাদের এই মুষ্টিমেয় দেব-যুবার আত্মবলিদানে। কত বড় বিপুল শক্তি শুধু আত্মশক্তির অ-পরিচয়ে, আত্মচেতনার অভাবে নিষ্ক্রিয় নির্বীর্য হয়ে দিনের পর দিন ক্লিষ্ট পিষ্ট পদদলিত হচ্ছে—শুধু সেইটুকু জানিয়ে যেতে পারলেই বুঝবো—আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। বাকি কাজ দেব-লোকের অনাগত যুবারা স্বল্পায়াসেই করতে পারবে।

দেব-সেনাদল : জয় শিব শঙ্কর ! জয় দেবলোকের জয় !

[ গান করিতে করিতে দেব-যুবাদলের অগ্র-গমন ]

বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে
হবে নব পরিচয় !
জয় জীবনের জয়॥

শক্তিহীনের বক্ষে জাগাব
শক্তির বিস্ময়।
জয় জীবনের জয়॥
ডঙ্কা বাজায়ে শঙ্কা-হরণে
আনিব সমরে অমর মরণে,
কণ্টক-ক্ষত নগ্ন চরণে
দলিব মৃত্যু-ভয়।
জয় জীবনের জয়॥
মরু-অরণ্য গিরি-পর্বতে রচিব রক্ত-পথ,
সেই পথ ধরি ভবিষ্যতের আসিবে বিজয়-রথ।

আমাদের শত শব-চিন্ ধরি
আসিবে শক্তি প্রলয়ঙ্করী,
আসিবে মোদের রক্ত সাঁতারি
নবীন অভ্যুদয়।
জয় জীবনের জয়॥

বিপ্লব-কুমার : সাবাস জোয়ান! এইবার হানো বজ্র, হানো ত্রিশুল, হানো পরশু—ঐ ভূতের বাথান লক্ষ করে।

[দেব-যুবাগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঊর্ধ্ব অধঃ সম্মুখ, পশ্চাত—সকল দিক দিয়া পশু-মুখ ভূতের দল অলক্ষ্য অস্ত্র হানিতে লাগিল।]

দেব-যুবাগণ : সেনাপতি! আমাদের অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বিপ্লব-কুমার : (যুদ্ধ করিতে করিতে) শুধু হাতে-পায়ে যুদ্ধ কর। হত আহত সৈনিকের হাত ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আক্রমণ কর। মনে রেখো বন্ধু আমরা কেউ ফিরে যাবার জন্য আসিনি!

[দেবযুবাগণ শুধু হাতে ভূতেদের উপর লাফাইয়া পড়িল। হত-আহত সৈনিকদের হাত-পা ছিঁড়িয়া লইয়া আঘাত হানিতে লাগিল। ভূতের তাম্বুতে ভীষণ সন্ত্রাস। কিচিরমিচির শব্দ উত্থিত হইতে এক অদৃশ্য মায়াজাল নিক্ষেপ করিল। দেব-যুবাগণ সেই জালের প্রভাবে শক্তিহীন হইয়া বদ্ধহস্ত-পদ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। ভূতেরা একে একে সকলকে বন্দি করিল।]

বিপ্লব-কুমার : শঙ্করী। রাক্ষুসী! এততেও তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি হল না? তোর বিজয়া দশমী কি চিরকালের জন্য হয়ে গেছে? আমার সেনাদল গেছে। আমি এখনো বেঁচে আছি। ওদের মায়াজালের বন্ধনকে অতিক্রম করে বাঁচার শক্তি আজো আমি হারাইনি। উঃ! পশ্চাৎ হতে আমায় আক্রমণ করেছে!

[ কৃষ্ণবাস-পরিহিত একদল ভূত বিপ্লব-কুমারকে ভীষণ আক্রমণ করিল। বিপ্লব-কুমার পড়িয়া গেল। ]

স্বাহা : ভয় নাই বীর, আমি এসেছি। ঐ দেখ পশ্চাতে আমার নারী-সেনাদল! ও-মায়াবী ভূতের মায়াজাল ছিন্ন করতে পারবে—এই মায়বিনী নারীসেনা! ওদের অস্ত্র ব্যর্থ করতে পারবো আমরাই।

বিপ্লব-কুমার : না দেবী, পারবে না। তুমি ভুলে যাচ্ছ, এ দেবতায় দেবতায় যুদ্ধ নয়। দেবতায় পশুতে যুদ্ধ এ। রক্ত-খেকো পশু আর রাক্ষস পুরুষ নারীর সমানে রক্ত শোষণ করে। ওদের শক্তিকে ভয় করি না, ভয় করি ওদের উলঙ্গ নির্লজ্জতাকে। ওরা তোমাদের—আমাদের দেবলোকের

প্রাণ-শক্তির অবমাননা করে যদি তার খর্বতা সাধন করে—আমাদের দেবলোক কোন দিনই ভূতের গ্রাস থেকে মুক্ত হবে না। তুমি ফিরে যাও—তোমার কাজ আমার এই হারাপথের সন্ধানী যুবকদেরে খুঁজে বের করা। তাদেরে এই মৃত্যু-পথের সন্ধান দেওয়া। আমরা আত্মদান করে ভয়-মুক্ত করে গেলাম জাতিকে, মৃত্যুঞ্জয় কবচ বেঁধে দিলাম দেব-লোকের যুব-শক্তির বাহুতে। এর পরে যারা আসবে এই পথে তারাই আমাদের শবের কঙ্কাল ধরে ধরে আমাদের আহতদের রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ করে যাবে আমাদের উদ্ধার সাধনে। ভূতের হাত থেকে অমৃতের উদ্ধার করে আমাদের বাঁচিয়ে তুলবে। সেইদিন আসব আমরা নতুন দেহে—নতুন রূপে। ধ্বংসের পূজারী-দল আসব নব-সৃষ্টির ধেয়ানী হয়ে! স্বাহা! আমি যাই। উঃ!

স্বাহা : (বিপ্লব-কুমারের উপর পড়িয়া) বন্ধু! প্রিয়! তোমার শেষ দান আমায় দিয়ে যাও।

বিপ্লবকুমার : আমার শেষ দান—আমার শক্তি তোমায় দিয়ে গেলাম। তারপর যা চাও, সে প্রীতি সে প্রেম—পাবে যখন আবার আমি আসব। সে আজ না, স্বাহা!

স্বাহা : (উঠিয়া পদধূলি লইয়া) তুমি শান্তিতে যাও বীর, আমি তোমার ব্রত গ্রহণ করলাম।

[ বিপ্লব-কুমার স্বাহার দক্ষিণ কর ললাটে ঠেকাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। ]

## যবনিকা